উপন্যাস

অচেনা মানুষ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
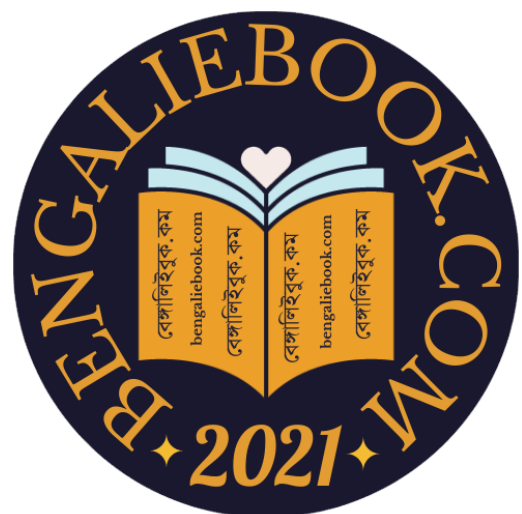
সূচিপত্র

১. বিহার আর পশ্চিমবাংলার সীমান্তের কাছাকাছি কোনো অঞ্চল..........2
২. বৃষ্টি থামেনি, সমানে পড়ছে.. 2 6
৩. কর্নেল সেন আবার হেসে... 3 4
৪. কর্নেল সেন গল্প থামিয়ে 7 2
৫. ওদের পীড়াপীড়িতে শেষপর্যন্ত 8 6

১. বিহার আর পশ্চিমবাংলার সীমান্তের কাছাকাছি কোনো অঞ্চল

কর্নেল সেন বললেন, জায়গার নামটা আমি বলব না। ধরে নাও, বিহার আর পশ্চিমবাংলার সীমান্তের কাছাকাছি কোনো অঞ্চল। সময়টা শীতকাল—নভেম্বর মাস, খুব জাঁকিয়ে শীত তখনও পড়েনি। গাড়িতে আমি একাই ছিলাম–

রঞ্জন বলল, কেন, জায়গাটার নাম বলতে আপনার আপত্তি কী? পটভূমিকা সম্পর্কে ভালো ধারণা না হলে গল্প জমে না।

কর্নেল সেন চুরুটের ছাই ঝাড়লেন, তারপর বললেন—প্রথম কথা, এটা গল্প নয়। আমি ঠিক গল্পের মতন গুছিয়ে বলতেও পারব না—যদিও অনেক সত্যি ঘটনা গল্পের চেয়েও রোমাঞ্চকর হয়। কিন্তু লেখকেরা যেরকম কায়দাকানুন করে আগাগোড়া সাসপেন্স বজায় রাখতে পারেন, সেরকম ক্ষমতা তো আমার নেই। আমি ঠিক যেরকম দেখেছিলাম, সেইরকমভাবেই বলে যাব। তা ছাড়া, জায়গাটার নাম-ধাম আমি বলতে চাই না, কারণ যে ঘটনা আমি বলতে যাচ্ছি, তার মধ্যে এমন অনেক লোকজনের নাম থাকবে, তাঁরা অনেকেই এখনও বেঁচে আছেন। তাঁদের চিনিয়ে দেওয়া ঠিক রুচিসম্মত হবে না। আমি অবশ্য নাম-টাম বদলেই বলব ঘটনাটা। ঘটেছিল বছর পনেরো আগে—যেখানে এটা হয়েছিল, সেখানে কাহিনিটা এখনও প্রচলিত। ওখানকার একটি বিশিষ্ট পরিবার এর সঙ্গে জড়িত। এক হিসেবে আমিই সেই পরিবারের বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। যাক গে, গোড়া থেকেই শুরু করা যাক।

আমি রামগড় থেকে ঘুরতে ঘুরতে পুরুলিয়ার দিকে আসছিলাম। ধরে নাও চাস রোডেই সেই বাংলোটা। আশেপাশে কোনো শহর নেই—বাংলোটা বলতে গেলে জনশূন্য মাঠের মধ্যে। তখনও ওসব জায়গায় ইলেকট্রিক যায়নি। এখনও গেছে কিনা আমি জানি না।

ডাকবাংলোটা নতুন তৈরি হয়েছে, বেশ ছিমছাম চেহারা। আমি সেখানেই সে রাতের জন্য বসতি নেব ঠিক করলুম।

আমি বললাম, কর্নেল সেন, আপনি তো চমৎকার বাংলা বলেন। কর্নেল সেন অবাক হয়ে বললেন, চমৎকার বাংলা বলি? এ-রকম কথা তো কেউ আমাকে আগে বলেনি। চমৎকারের কী দেখলে?

না, আপনার কথার মধ্যে বেশি ইংরেজি শব্দ থাকে না। বেশ ঝরঝরে সহজবোধ্য ভাষা।

বাঃ, বাঙালির ছেলে হয়ে এটুকু বাংলা বলতে পারব না কেন?

আপনি এতদিন আর্মিতে ছিলেন। আর্মির লোকেরা খুব সাহেব হয়। ইংরেজি ছাড়া আর কিছু বলতে চায় না। তা ছাড়া আপনি অনেক দিন বাংলা দেশের বাইরে ছিলেন–

কর্নেল সেন হাসলেন। হাসতে হাসতে বললেন, আর্মির লোকরা খুব সাহেব হয়? তা অবশ্য অনেকটা ঠিক। নানা জায়গার লোক থাকে–তাই ইংরেজিটাই হয় সকলের সাধারণ ভাষা। কিন্তু ইংরেজিতে কথা বললেই যে সাহেবদের মতন চালচলন দেখাতে হবে তার কোনো মানে আমি বুঝতে পারি না। আর যারা মাতৃভাষা ভুলে যায়, তাদের আমি ঘৃণা করি।

যাই বলুন, আর্মির লোকজনের মধ্যে আপনি একজন ব্যতিক্রম। বার বার আর্মির লোক আর্মির লোক বলছ, তাতে মনে হতে পারে, আমি বোধহয় বন্দুক-মেশিনগান নিয়ে যুদ্ধ করেছি। তা নয়–আমি একজন ডাক্তার। কিছু দিন আর্মিতে চাকরি করেছি!

আপনি ডাক্তার? তা কিন্তু জানতাম না। রঞ্জন যখন বলেছিল, ওর মামা আসছেন, কর্নেল সেন–তখন আমি ভেবেছিলাম তিনি নিশ্চয়ই একজন ঝানু সোলজার।

না, আমি যুদ্ধ করিনি। আর্মিতে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সবারই র‍্যাংক থাকে। আমি অবশ্য পুরোপুরি কর্নেল নই। লেফটেন্যান্ট কর্নেল। অতখানি উচ্চারণ করার অসুবিধে বলে

অনেকে শুধু কর্নেল বলে। যাই হোক, আর্মির লোক বলে সবাইকে কিন্তু এক শ্রেণিতে ফেলবে না। আমি নেফা অঞ্চলে একজন সত্যিকারের আর্মি কর্নেল দেখেছিলাম, তিনি অগাধ পন্ডিত, ট্রাইবালদের ভাষা নিয়ে কত চর্চা করেছেন, যদিও বাইরে সে বিদ্যে জাহির করেন না। সেনাবাহিনীর অফিসার র‍্যাংকে সাধারণত ভালো ভালো ছাত্ররাই যায়।

রঞ্জন আমাকে ধমকে দিয়ে বলল, তুই বড় গল্পের মাঝখানে বাধা দিস। মামাবাবু, আপনি গল্পটা বলুন?

রঞ্জনের মামা কর্নেল সেন থাকেন লাদাখে। ওখানে একটি সরকারি হাসপাতাল পরিচালনা করেন। পশ্চিমবাংলার সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ খুবই কম। কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় এসেছেন। বছর পঞ্চাশেক বয়েস, সুপুরুষ, সুঠাম স্বাস্থ্য। কথাবার্তায় অত্যন্ত ভদ্র। বিয়ে-থা করেননি, গরিব-দুঃখীদের চিকিৎসার কাজেই আত্মনিয়োগ করেছেন। কিন্তু ওঁর কথাবার্তায় সেসব কিছুই প্রকাশ পায় না। নিজের সম্পর্কে উনি খুবই কম কথা বলেন। ব্যবহারের মধ্যে বেশ মার্জিত ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে—কিন্তু তার মধ্যে কোনো কঠোরতা নেই।

রঞ্জন ওর মামাবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য আমাকে আজ রাত্তিরে খাবার নেমন্তন্ন করেছিল। আর একজন বন্ধু এবং তার স্ত্রীকেও বলেছিল, কিন্তু তারা আসতে

পারেনি। কয়েকদিন ধরেই আবহাওয়া বেশ খারাপ যাচ্ছে। আজ সারাদিনে বৃষ্টি হয়ে গেছে। কয়েকবার। রাত ন-টা থেকে বৃষ্টি নামল অসম্ভব তোড়ে। রঞ্জনের বাড়ির সামনে এক কোমর জল জমে গেল। আমার বাড়ির সামনেও নিশ্চয়ই এতক্ষণ একবুক জল। রঞ্জন বলল, তাহলে সুনীল, তোকে আজ আর বাড়ি ফিরতে হবে না। ফোন করে দে এখানেই থেকে যাবি!

রঞ্জনের মামাবাবুর সঙ্গে গল্পে এত জমে গিয়েছিলুম যে আমার বাড়ি না-ফেরায় বিশেষ আপত্তি হল না। খাওয়াদাওয়ার পর বাইরের ঘরে জমিয়ে বসলাম। মামাবাবু চুরুট ধরিয়েছেন এবং গোড়াতেই আমাদের সিগারেট খাবার অনুমতি দিয়ে রেখেছেন।

মামাবাবু ঘুরেছেন অনেক দেশে। আর্মিতে ঢোকার আগে উনি ইউরোপ-আমেরিকা ঘুরে এসেছেন, তারপর সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে চষে বেড়িয়েছেন সারা ভারতবর্ষ। আমরা অনুরোধ করলাম, মামাবাবু আপনার তো অনেক অভিজ্ঞতা—তার থেকে দারুণ একটা গল্প বলুন আমাদের। শুনতে শুনতে যদি গা ছমছম করে তাহলে বৃষ্টির দিনে বেশ জমবে।

মামাবাবু বললেন, আমি আর কী বলব! আমি তো গল্প বলতে জানি না। তোমরাই বরং বলো—পশ্চিমবাংলার খবরটবর কী। আমরা তো অতদূর থেকে খবর পাই না।

রঞ্জন বলল, পশ্চিমবাংলার খবর একঘেয়ে হয়ে গেছে। ও নিয়ে আর কথা বলতে ইচ্ছে করে না। আপনি একটা গল্প বলুন!

কিন্তু আমি যে গল্প-টল্প বলতে জানি না।

আমি বললাম, গল্প মানে কী? বানিয়ে বলতে হবে না—আপনি আপনার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলুন না। আপনি জীবনে এত কিছু দেখেছেন—

মামাবাবু খানিকটা ভেবে বললেন, আমি অনেক জায়গায় ঘুরেছি বটে কিন্তু সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়েছে খুব কাছাকাছি জায়গায়—বিহার আর পশ্চিমবাংলার সীমান্তেই এক জায়গায়। জায়গাটার নাম বলব না—

আমি রঞ্জনকে বললাম, তোর বউকে ডাকবি না? মাধবীকে ডাক!

রঞ্জন বলল, ও থাক। ও তো একটু বাদেই ঘুমিয়ে পড়বে। বেশি রাত জাগতেই পারে না-

ডাক-না, ঘুম পেলে উঠে যাবে না হয়!

মাধবী দরজার পাশ থেকে বলল, আমি এক্ষুনি আসছি। চাকরের খাবারটা দিয়েই আসছি। মামাবাবু, আমি না এলে আরম্ভ করবেন না কিন্তু!

মাধবী এসে বসার পর মামাবাবু স্মিতভাবে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। তারপর বললেন, মাধবী থাকলে আমার গল্পটা বলতে একটু অসুবিধে হবে অবশ্য। তা হলে এটা বরং থাক। আমি অন্য আর কোনো ঘটনার কথা বলা যায় কিনা ভেবে দেখি। এর মধ্যে কিছুটা মেয়েঘটিত ব্যাপার আছে–

মাধবী আদুরে গলায় বলল, মামাবাবু, আমি বাচ্চা মেয়ে নই। ওদের সামনে যা বলতে পারেন, আমার সামনে তা পারেন না?

ছেলেদের সামনে যা বলা যায় মেয়েদের সামনেও কি আর তা মামাবাবু, আপনি জানেন না, আজকাল ছেলেরা মেয়েদের সামনে আর কিছু ঢাকাঢুকি রাখে না। সব বলে দেয়। এমনকী স্বামীরা অন্য মেয়ের সঙ্গে প্রেম করলেও সে-কথা বউদের কাছে লুকোয় না।

মাধবী রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে ভঙ্গি করল। কর্নেল সেন হাসতে হাসতে বললেন, তাই নাকি? বাঃ, এ তো বেশ ভালোই ব্যাপার! এতটা বদলে গেছে? কিন্তু আমার তবু একটু বাধো বাধো ঠেকবে। আমি তো একটু পুরোনো কালের লোক! আচ্ছা দেখা যাক–

রঞ্জন বাধা দিয়ে বলে উঠল, তা বলে মামাবাবু, গল্পটা কিন্তু সেনসার করে বলবেন না! একেই তো সিনেমার সেনসারের জ্বালায় আমরা অস্থির।

বয়েসে অনেক বড়ো হলেও কর্নেল সেন এসব কথা বেশ সহজভাবে নিতে পারেন। রঞ্জনের কথা শুনে আন্তরিকভাবে হেসে উঠলেন।

এবার গল্প শুরু হল। কর্নেল সেন চুরুটে অল্প ধোঁয়া ছেড়ে বলতে লাগলেন। চোখের দৃষ্টি দেখলে বোঝা যায়, উনি অতীতে ফিরে গেছেন। উনি বসেছেন একটা ইজিচেয়ারে, জানলার পাশে। রঞ্জন আর আমি একটা সোফায়। আর একটা সোফায় মাধবী পা গুটিয়ে বসেছে আরাম করে।

কর্নেল সেন বললেন, তখন আমার বয়েস হবে তেত্রিশ কী চৌত্রিশ। আমি তখন রামগড়ে পোস্টেড। আমার এক কাকা থাকতেন পুরুলিয়ার। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য আসছিলাম। গাড়ি নিয়ে একা বেরিয়ে পড়েছি। অনেক পথঘাট তখন নতুন তৈরি হচ্ছে। ঠিকমতো পথের হদিশ পাওয়া যায় না। এক-একজন এক একটা ভুল রাস্তা দেখিয়ে দেয়। ঘণ্টা ছয়েকের পথ, কিন্তু বেলা বারোটাতে বেরিয়েও অনেক ঘুরতে হল। রাত নটার সময়েও বিহারের সীমানা পার হতে পারিনি। রাস্তা একেবারে ফাঁকা, আলো নেই—একটু ভয় ভয় করতে লাগল। আজকাল নিশ্চয়ই ওসব রাস্তায় সারারাত গাড়ি চলে।

রঞ্জন বলল, না, মামাবাবু। ট্রাক ড্রাইভাররা ছাড়া রাত্রে কেউ গাড়ি চালাতে সাহস করে ওই সব রাস্তায়। বিশেষত বর্ডারের কাছে প্রায়ই ডাকাতি হয়। কর্নেল সেন বললেন, আমার কাছে অবশ্য ডাকাতি করার মতন বিশেষ কিছু ছিল না।

তবু, গাড়িটা কেড়ে নিয়ে যদি রাস্তায় একা ছেড়ে দেয়, সেও এক ঝামেলা। হঠাৎ একটা ডাকবাংলো চোখে পড়ল। তখন ভাবলাম, ডাকবাংলোতে রাতটা কাটিয়ে ভোরে বেরোলেই হবে।

পি ডব্লুডি-র ইনস্পেকশন বাংলো। এই সব বাংলোতে আগে থেকে রিজার্ভ করার দরকার হয় না। খালি থাকলে ঢুকে পড়া যায়। আর বাংলোটা এমন একটা ফাঁকা মাঠের মধ্যে যে সেখানে নিশ্চয়ই সচরাচর কেউ রাত্রিবাস করে না।

কর্নেল সেনের চুরুটটা নিভে গিয়েছিল। তিনি সেটা ধরাবার জন্য একটু থামলেন। সেই সুযোগে আমি আর রঞ্জন সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে চোখাচোখি করলাম। আমি আর রঞ্জনও বহু বাংলোতে থেকেছি, আমাদেরও অনেক অভিজ্ঞতা আছে। দেখা যাক, রঞ্জনের মামাবাবুর অভিজ্ঞতাটা কী ধরনের।

কর্নেল সেন বললেন, গাড়িটা ঢুকিয়ে দিলাম ডাকবাংলোর কম্পাউণ্ডে। সেখানে ইলেকট্রিক নেই, বারান্দায় হ্যাজাক জ্বলছে। ঘর তালাবন্ধ। জনমনুষ্য দেখা গেল না। চৌকিদার, চৌকিদার বলে দু-বার হাঁক দিলাম। কোনো সাড়াশব্দ নেই।

বোঝাই গেল, এই সব ডাকবাংলোতে কালেভদ্রে কেউ আসে। এত রাত্রে বোধহয় কেউই আসে না। চৌকিদারটা তাই আড্ডা মারতে গেছে। কিংবা নেশা-টেশা করে হয়তো ঘুমিয়ে আছে। কারুর কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে ভাবলাম চলে যাব কিনা। কিন্তু সারাদিন ঘুরে তখন আমার খুবই ক্লান্তি এসেছে, তার ওপর একটু জ্বরজ্বর ভাব। এদিকে টিপটিপ করে বৃষ্টি নামল হঠাৎ। শীতকালের বৃষ্টিতে জানই তো কীরকম শিরশিরে শীত করে। কপালে হাত দিয়ে মনে হল, জ্বরই এসেছে। এখন শরীর চাইছে বিছানা।

ডাকবাংলোর চারপাশটা একটু ঘুরে দেখতে গেলাম। ডাকবাংলোটা দেখেই মনে হল নতুন তৈরি হয়েছে—বছরখানেকও হবে না—সব কিছুই ঝকঝক করছে। একটু দূরে একটা টালির ঘর—সাধারণত ওইরকম ঘরে চৌকিদার থাকে। সেখানে গিয়ে দেখি, সে-ঘরের দরজাটাও বন্ধ। দু-বার ঠেলা দিলাম, আবার ডাকলাম চৌকিদারকে। কোনো সাড়া নেই। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ, নিশ্চয়ই ভেতরে কেউ আছে, কিন্তু খুলছে না। বেশ কয়েকবার ধাক্কাধাক্কি করলাম দরজার, তাতে কুম্ভকর্ণেরও ঘুম ভেঙে যাবার কথা, কিন্তু চৌকিদারটা উঠল না।

মহাবিরক্তিকর অবস্থা। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ যখন, তখন ঘরের মধ্যে নিশ্চয়ই মানুষ আছে। অথচ আমার ডাকে সাড়া দিল না কেন—এ নিয়ে একটা সন্দেহ আমার মনে জাগা উচিত ছিল, কিন্তু সে-সময় আমি ও ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাইনি। শরীর ভালো ছিল না, মেজাজও ভালো ছিল না।

সেখান থেকে চলে আসছি, হঠাৎ চোখে পড়ল ডাকবাংলোর পিছনে দেওয়াল ঘেঁষে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার গায়ের রং কালো কুচকুচে, ঠিক যেন অন্ধকারে মিশে আছে। বেশ লম্বা, বলিষ্ঠ দেহ।

জিজ্ঞেস করলাম, কে ওখানে? তুমি চৌকিদার নাকি?

লোকটা কোনো সাড়া দিল না। আমি এগিয়ে গেলাম। লোকটি তখন নীচু হয়ে মাটি থেকে কী যেন খুঁজছে। আমি তার সামনে গিয়ে বললাম, এই চৌকিদার কোথায়?

লোকটি মুখ তুলে বলল, আমিই চৌকিদার!

প্রচন্ড রাগ হল! ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি চৌকিদার তো এতক্ষণ সাড়া দাওনি কেন?

হুজুর, আমি কানে শুনতে পাই না।

কানে শুনতে না-পাওয়া একজন মানুষের দোষ না। কিন্তু কানে কালা লোকদের চৌকিদারের চাকরি দেওয়ারও কোনো মানে হয় না। কিন্তু তা নিয়ে তখন রাগারাগি করে লাভ নেই।

কানে শুনতে পাও না, কিন্তু আমাকে তো দেখতে পেয়েছিলে? নাকি চোখেও দেখতে পাও না?

আমি এখানে একটা জিনিস খুঁজছিলাম—তাই আপনাকে দেখতে পাইনি।

এত রাত্রে কী খুঁজছ এখানে?

আমার ক-টা পয়সা পড়ে গেছে। একটা সিকি কিছুতেই পাচ্ছি না।

ঠিক আছে, কামরা খুলে দাও। আমি আজ রাত্তিরে এখানে থাকব।

কামরা তো রিজার্ভ আছে।

রিজার্ভ আছে? কার নামে রিজার্ভ আছে?

আছে এক সাহেবের নামে।

লোকটার ভাবভঙ্গি আমার ভালো লাগছিল না, বিশ্বাস হল না ওর কথা। বললাম, কোথায়, রিজার্ভেশন স্লিপ কোথায়? সেটা তো বাইরে ঝোলাবার কথা।

লোকটা বলল, এখানে ঘর খালি নেই। সাত মাইল দূরে আর একটা ডাকবাংলো আছে, আপনি সেখানে যান-না-জায়গা পেয়ে যাবেন!

আমি বললাম, কেন, সেখানে যাব কেন? এখানে তো দুটো ঘরই খালি দেখছি—বাইরে থেকে তালা ঝুলছে।

ওই দুটো কামরাই এক সাহেবের নামে রিজার্ভ আছে। সাহেব হঠাৎ এসে পড়লে আমার নোকরি চলে যাবে।

স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, লোকটা মিথ্যেকথা বলছে। যেকোনো কারণেই হোক আমাকে থাকতে দিতে চায় না। এক ধমক দিয়ে বললাম, রিজার্ভ আছে? কই, সেই চিঠি দেখাও।

লোকটা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এতক্ষণ আমার সব কথা সে বেশ শুনতে পাচ্ছিল, কিন্তু এখন আবার কালা সেজে গেল। জেদ চেপে গেল আমার। আমি বললাম, দেখাও স্লিপ। কথা শুনতে পাচ্ছ না?

আমার পরনে সামরিকবাহিনীর পোশাক। সেই সময় আমি আবার মোটা গোঁফ রাখতাম। সুতরাং আমাকে হেলাফেলা করতে পারে না। বুঝতেই পারলাম, লোকটা ভয় পেয়েছে। নির্বোধ চোখে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বললাম, যাও, চাবি নিয়ে এসো। যদি রিজার্ভ করা থাকেও, এত রাত্রে কেউ আসবে না। আমি কাল সকালেই চলে যাব। ঘর খুলে দাও।

পাশাপাশি দুটো ঘর, সামনে টানা বারান্দা। বৃষ্টি চেপে এসেছে। আমি দৌড়ে বারান্দায় উঠলাম। চৌকিদারটা চাবি আনতে গেছে তো গেছেই। আসার আর নাম নেই। খালি ডাকবাংলো খুলে দিতে ওর আপত্তির কারণটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। ও তো

আমার কাছে কিছু বকশিশ পাবেই। তা ছাড়া যদি খাবারদাবারের ব্যবস্থা করে দেয়, তারও কিছু ভাগ পাবে।

আবার ডাকলাম চৌকিদারকে। কিন্তু সত্যিই যদি কানে কালা হয়, তাহলে শুনতে পাবে না। এই বৃষ্টির মধ্যে ওকে যদি আবার ডাকতে যেতে হয়-

বেশ কয়েক মিনিট কেটে গেল, চৌকিদার তখনও এল না। ও কি আমাকে এখানেই সারা রাত দাঁড় করিয়ে রাখতে চায়? বারান্দায় একটা চেয়ারও নেই যে বসব। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার, বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখ ব্যথা করে। একবার ভাবলাম, মাইল সাতেক দূরে যখন আর একটা বাংলো আছে, তখন সেটাতেই যাব কিনা। এই বিদঘুটে বাংলোর চাইতে সেটা নিশ্চয়ই ভালো হবে। কিন্তু, এই চৌকিদারটা আমাকে থাকতে না-দিতে চাইছেই-বা কেন? মনে হল চৌকিদারটা যেন দূরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে লক্ষ করছে—আমি চলে যাই কি না। আমি ঠিক করলাম, এখানেই থাকব। গলা চড়িয়ে ফের হাঁক দিলাম, চৌকিদার

শেষপর্যন্ত লোকটি এল চাবি নিয়ে। সেই সঙ্গে রেজিস্টার বুক। সেটা খুলে দেখলাম, মাস দেড়েক আগে একজন সার্কেল অফিসার এসেছিলেন সপরিবারে, তারপর আর কেউ আসেনি। অনেক সময় অবশ্য বাইরের লোক এলে এরা খাতায় নাম এনট্রি করে না, টাকাটা নিজেই নিয়ে নেয়। আমার বেলায় অবশ্য খাতাটা আগেই এনেছে—সম্ভবত আমার সামরিক পোশাক দেখে।

ওর আসতে এত দেরি হল কেন—একথা জিজ্ঞেস করার আগেই লোকটা বললে, হুজুর, চাবি খুঁজে পাচ্ছিলাম না!

যে লোক কানে শুনতে পায় না এবং সময় মতন চাবি খুঁজে পায় না—সে ডাকবাংলোর চৌকিদার হিসেবে খুবই অযোগ্য। লোকটির চেহারা দেখলে কিন্তু খুব বোকাসোকা মনে

হয়। যাই হোক আমি ঠিক করলাম, আর মেজাজ গরম করব না। একটা মাত্র রাত কাটাবার তো ব্যাপার!

আমি লোকটিকে বললাম, এখানে তো বিশেষ কেউ আসেই না দেখছি। তুমি এটা রিজার্ভ আছে বলে আমাকে মিথ্যেকথা বলছিলে কেন?

না হুজুর, একটা চিঠি এসেছিল। আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

ঠিক আছে তুমি ঘর খোলো। দুটো তো ঘর রয়েছে। তা ছাড়া আমি কাল সকালেই চলে যাব।

লোকটি একটি ঘর খুলল। সেই ঘরটা অবশ্য ভালোই, আমার কোনো অসুবিধে হওয়ার কথা নয়, তবু আমি জিজ্ঞেস করলাম, পাশের ঘরটা কীরকম? খোললা তো।

হুজুর, ওঘরটা পরিষ্কার করা নেই।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। আমার সঙ্গে শুধু একটা সুটকেস, মালপত্র কিছু বিশেষ নেই। বিছানাও নেই। আমার ধমক খেয়ে লোকটি কম্বল বার করে দিল।

তোমার নাম কী?

রামদাস।

ঠিক আছে, তুমি কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে পারবে?

না হুজুর। খাবারের ব্যবস্থা কিছু নেই। এখানে কিছু পাওয়া যায় না।

যারা এখানে আসে, তারা খায় কী? কাছাকাছি গ্রাম নেই?

আছে, দু-মাইল দূরে। এতরাত্রে সেখানে কিছু পাওয়া যাবে না।

তুমি অন্তত একটু চা বানিয়ে দিতে পারবে?

চা, দুধ কিছু নেই।

স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, লোকটি আমার সঙ্গে কোনো সহযোগিতাই করতে চায় না। বকশিশের লোভও নেই ওর? আমার অবশ্য খিদে খুব একটা ছিল না। কিন্তু এক কাপ গরম চা পেলে ভালোই লাগত। তা ছাড়া খাবার পাওয়া যাবে না শুনলেই খিদে পেতে শুরু করে। রামদাসের ওপর রাগ আমার ক্রমশ বাড়ছিল। ওর নামে কমপ্লেন করা উচিত। খালি থাকতেও যদি ডাকবাংলোয় এসে দরকারের সময় জায়গা পাওয়া না যায় কিংবা খাবারের ব্যবস্থা না থাকে—তাহলে এগুলো তৈরি করার মানে কী? তা ছাড়া লোকটি যদি আমার সঙ্গে একটু ভালোভাবে কথা বলত তাহলেই আমি ওকে ক্ষমা করতে পারতুম।

কিন্তু লোকটা সব সময় গুম মেরে আছে। কিছু জিজ্ঞেস করলে ভালো করে উত্তর দেয় না।

রঞ্জন হঠাৎ বলে উঠল, মামাবাবু, আপনার বোধ হয় ডাকবাংলো সম্পর্কে বেশি অভিজ্ঞতা নেই। নইলে ওরকম বাংলোয় আপনার থাকা উচিত হয় কি?

মাধবী বলল, আপনার ভয় করছিল না? অত ফাঁকা জায়গায়, চৌকিদারটা পাজি

কর্নেল সেন হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কেন ভয় কেন? আমার সঙ্গে তো দামি জিনিসপত্র বিশেষ কিছু ছিল না। তা ছাড়া মিলিটারির লোকদেরই লোকে ভয় পায়।

রঞ্জন বলল, আমি জানি, ওইরকম বাংলোয় এমন সব ঘটনা ঘটে–

রঞ্জনকে বাধা দিয়ে আমি বললাম, তুই চুপ কর তো। ওইখানে নিশ্চয়ই সে-রকম একটা কিছু ঘটেছিল, নইলে উনি এই বাংলোর অভিজ্ঞতার কথাটাই বা বলবেন কেন?

মাধবী তাড়াতাড়ি বলে উঠল এটা ভূতের গল্প নয় তো?

কেন, ভূতের গল্প হলে তোমার আপত্তি আছে?

তা না হলে কাল সকালে শুনব! ভূতের গল্প আমার রাত্তিরে শুনতে ভালো লাগে না–

রঞ্জন তার স্ত্রীকে বলল, তাহলে খুকুমণি তুমি শুতে যাও না, কে তোমাকে আটকে রেখেছে! এটা নির্ঘাত ভূতের গল্প!

আমি রঞ্জনকে বললাম, আঃ, চুপ কর না! গল্পটা শুনতে দে–

কর্নেল সেন বললেন, আমি এ-রকম ফাঁকা জায়গায় অনেকবার একা রাত কাটিয়েছি, ভূত-টুতের দেখা পাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কখনো দেখা হয়নি। তবে ভূতের ভয় পেয়েছিলাম একবার। এক্ষুনি বলছি সেই কথা। সেদিন সেই বাংলোতে চৌকিদারের ব্যবহার আমার খুব অদ্ভুত লেগেছিল। ও যেন আমাকে ওখান থেকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। ওর কাছ থেকে কোনো সাহায্যই পাওয়া যাবে না। বিরক্ত হয়ে বললাম, ঠিক আছে, তুমি যাও! তারপর চৌকিদার চলে যাওয়ার পর আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম আর আসতে চায় না। খালি পেটে সহজে ঘুম আসতে চায় না।

একবার দরজা খুলে বাইরে এলাম। বৃষ্টি থেমে গেছে। গাড়িটার সব দরজা লক করা আছে কি না দেখলাম। চৌকিদারের ঘরে তখন আলো জ্বলছে। কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঘুরে বেড়ালাম খানিকক্ষণ। চারদিকে অসম্ভব চুপচাপ। বড়োরাস্তা দিয়ে একটাও গাড়ি যাচ্ছে না। বাংলোর কম্পাউণ্ডের ওপাশে একটা উঁচু বাঁধের মতো। ওপরে উঠে দেখলাম, পাশেই একটা খাল। তার উলটো দিকে আট-দশটা খড় ও টিনের বাড়ি। চৌকিদারটা মিথ্যেবাদী, ও বলেছিল গ্রাম দু-মাইল দূরে। অথচ এত কাছেই তো বাড়ি রয়েছে।

ফিরে এলাম নিজের ঘরে। কেন জানি না, খুবই অস্বস্তি লাগছে, কিছুতেই শুতে ইচ্ছে করছে না। আর মনে হচ্ছিল, ঘরের মধ্যে একটা যেন ক্ষীণ গন্ধ পাচ্ছি। ঘরে ঢোকার পর থেকেই গন্ধটা নাকে আসছিল। আগে ঠিক খেয়াল করিনি। ডেটলের গন্ধের মতন। অবশ্য

আমি ডাক্তার মানুষ, ডেটলের গন্ধ শোঁকা অভ্যেস বলেই বোধ হয় কল্পনা করেছিলাম সেটা। নইলে, অতরাত্রে বাংলোর মধ্যে ডেটলের গন্ধ আসবে কোথা থেকে?

আমার ঘরের তিনটে দরজা। একটা দরজা বারান্দার দিকে, উলটো দিকে আর একটা বাথরুমের—বাকি দরজাটা খুলে দেখতে হল। সেটা খুলতেই আমি চলে এলাম পাশের ঘরে। দরজাটার ছিটকিনি লাগানো ছিল না।

পাশের ঘরে এসে চৌকিদারটার ওপর আমি আরও রেগে গেলাম। ও বলেছিল, এই ঘরটা অপরিষ্কার হয়ে আছে! কিন্তু ঠিক তার উলটো, সেই ঘরটিই বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মনে হয় সে-দিন বিকেলেই সাফ করা হয়েছে। এই ঘরে ডেটলের গন্ধ আরও বেশি। এদিক-ওদিক তাকিয়েও এই গন্ধের কোনো কারণ বুঝতে পারলাম না। দুটো খাট পাশাপাশি জোড়া দিয়ে তার ওপর নিখুঁতভাবে বিছানা পাতা। ধপধপে চাদর। চৌকিদারটার মিথ্যেকথা বলার মানে কী! এঘরে কি অন্য কেউ থাকে? চৌকিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে অনেক সময় বাইরের লোক ডাকবাংলোয় পাকাপাকি আস্তানা গাড়ে। হোটেলের চেয়ে অনেক সস্তা হয়। কিন্তু এখানে এই ফাঁকা মাঠের মধ্যে কে থাকতে আসবে? তা ছাড়া, ঘরটায় এমন কোনো জিনিসপত্র নেই—যা থেকে বোঝা যাবে সেখানে কেউ নিয়মিত থাকে।

আমার গোঁ চাপল যে, আমি এঘরটাতেই থাকব। আমার ঘরে সিঙ্গল খাট, ওই ঘরে ডবল খাট-হাত-পা ছড়িয়ে শোয়া যাবে। পাশের ঘর থেকে আমার সুটকেস ও জামাকাপড় নিয়ে এলাম। এই ঘরটায় দরজায় বাইরের থেকে তালাবন্ধ, তবু আমি ছিটকিনি দিয়ে দিলাম ভেতর থেকে। অন্য সব দরজা-টরজাও আটকালাম, হ্যাজাকটা সম্পূর্ণ না নিভিয়ে খুব কমিয়ে রেখে দিলাম টেবিলের ওপরে। সুটকেস থেকে আমার রিভলবারটা বার করে রেখে দিলাম বালিশের নীচে।

রঞ্জন জিজ্ঞেস করল, আপনার সঙ্গে বুঝি সবসময় রিভলবার থাকে?

কর্নেল সেন বললেন, তখন থাকত। বিহার শরিফে একবার গুণ্ডার পাল্লায় পড়েছিলাম–তারপর থেকে গান পারমিট করিয়ে নিয়েছিলাম।

মাধবী জিজ্ঞেস করলে, কী হয়েছিল বিহার শরিফে?

কর্নেল সেন বললেন, সে-গল্প শোননি? সেবার তো রঞ্জনের কাকা–অর্থাৎ তোমার খুড়শ্বশুর শৈলেনও আমার সঙ্গে ছিল। বিহার শরিফের কাছে গুণ্ডাদের পাল্লায় পড়েছিলাম। প্রাণেই মেরে ফেলত–শৈলেনের কাঁধে তো ছুরিও মেরেছিল–

আমি বললাম, সেটা অন্য গল্প। সেটা এখন থাক। এখন আগে এই ডাকবাংলোর গল্পটাই শোনা যাক।

কর্নেল সেন বললেন, ঠিক বলেছ, সে-ই ভালো। এক গল্পের মধ্যে অন্য গল্প এসে যাচ্ছিল। ডাকবাংলোর ঘটনাটাই বেশি চমকপ্রদ। সেই রাত্তিরে বেশ কিছুক্ষণ জেগে থাকার পর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু ঘুমটা গাঢ় হয়নি। নতুন জায়গায় গেলে মানুষের সাধারণত পাতলা ঘুমই হয়। এটা হচ্ছে এক ধরনের সহজাত ডিফেন্স ইন্সটিংক্ট। যাই হোক, ঘুমের মধ্যেই অস্পষ্টভাবে একবার মনে হল, কাছাকাছি একটা গাড়ির আওয়াজ। একবার মনে হল, দূরের রাস্তা দিয়েই যাচ্ছে গাড়িটা, আবার মনে হল, বাংলোর কম্পাউণ্ডেই ঢুকেছে। তাহলে কি যাদের আসবার কথা ছিল, তারা এসেছে? কিন্তু এত রাতে? একটুক্ষণ কান পেতে অপেক্ষা করার পর আর কোনো আওয়াজ পেলাম না। লোকের পায়ের আওয়াজ কিংবা বারান্দায় উঠে চৌকিদারকে ডাকাডাকি তো শুনতে পাব। তার কিছুই না। তখন বুঝতে পারলাম, আমারই মনের ভুল। রাস্তা দিয়ে কোনো গাড়ি চলে গেছে আমি ভেবেছি বাংলোতে এসেছে। রাত্তির বেলা, বিশেষত নির্জন জায়গায়, দূরের আওয়াজও কাছের মনে হয়।

এইসব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছি। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। কিন্তু সেটাও ঠিক শান্ত নিরুদবিগ্ন ঘুম নয়। কিছু একটা অস্বস্তি থেকেই গিয়েছিল। কোথায় যেন খুটখাট শব্দ শুনছি, কে যেন, কোনো একটা ভারী জিনিস ধরে টানছে, কেউ ফিসফাস করে কথা

বলছে। একবার চোখ মেলে তাকিয়ে ভালো করে খেয়াল করার চেষ্টা করলাম। কোথাও কিছুই নেই। সবই আমার মনের ভুল। ভূতুড়ে ডাকবাংলো নিয়ে অনেক গল্প-টল্প পড়েছি তো –মনের মধ্যে সেগুলোই বোধ হয় কাজ করছিল। বাংলার থেকে ইংরেজিতেই এসব গল্প বেশি আছে। ভূতুড়ে ডাকবাংলো সাধারণত খুব পুরোনোনা হয়। কিন্তু এই বাংলোটা প্রায় নতুন। নতুন বাড়ি ভূতদের সহ্য হয় না।

আবার চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করলাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলামও। এবার ঘুম ভাঙল স্পষ্ট একটা অনুভূতিতে। মুখের ওপর সুড়সুড়ির মতন ভাব, কেউ যেন আমার মুখের ওপর চামর বুলিয়ে দিচ্ছে। চোখ মেলে তাকালাম। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম আশপাশে। কোথাও কিছু নেই। এটাও আমার মনের ভুল ছাড়া আর কীই-বা হবে। তাহলে হয়তো স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু এ-রকম অদ্ভুত স্বপ্ন দেখবার মানে কী? রাত দুপুরে আমার মুখে চামর বোলাতে আসবে কে? ভূতের কী আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই? তা ছাড়া খুব ছেলেবেলায় মুশকিল আসানদের হাতে চামর দেখতাম, তারপর তো আর দেখিইনি।

এবার মনটা শান্ত করে আবার ঘুমোবার উদ্যোগ করলাম। কিন্তু চোখ বোজবার পরই মনে হল, না, মনের ভুল হতেই পারে না! আমার মন তো এতখানি কল্পনাপ্রবণ নয়। স্পষ্ট অনুভব করেছি, আমার মুখে চামরের মতন কিছু একটার ছোঁয়া লেগেছে। এটা একটা বাস্তব অনুভূতি। অর্থাৎ সত্যিই এ-রকম একটা কোনো জিনিস আছে এই ঘরের মধ্যে। কী হতে পারে? কোনো পাখি-টাখি নয় তো! চোখ খুলে তাকালাম আবার। এই ঘরের মধ্যে পাখি কী করে আসবে? ব্যাপারটার যতক্ষণ না কোনো নিষ্পত্তি করতে পারছি, ততক্ষণ আর ঘুম আসবে না।

তারপর ভাবলাম, যদি পাখি বা বাদুড়-টাদুড় কিছু হয়, তাহলে একটুক্ষণ অপেক্ষা করলেই আবার তাদের উপস্থিতি টের পাওয়া যাবে। চোখ খোলা রেখে স্থির হয়ে শুয়ে রইলাম। ঘরের মধ্যে বা বাইরে কোথাও কোনো শব্দ নেই। অদ্ভুত নিস্তব্ধ রাত। হঠাৎ মনে হল, আমি খুব ক্ষীণ একটা নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আমার নিজের নয়, অন্য কারুর। একবার, দু-বার, তিনবার–

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। হ্যাজাকের মৃদু আলোয় ঘরটা আবছায়া। ঘাড় ঘোরাতেই দেখতে পেলাম আমার শিয়রের কাছে দেওয়াল ঘেঁষে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটার মাথায় চুল ভোলা। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম, সেই চুলের ঝাপটা লেগেছিল আমার মুখে।

মাধবী বিবর্ণ মুখে বলল ভূত?

রঞ্জন তার কাঁধে হাত রেখে বলল, চুপ।

কর্নেল সেন বললেন, আমারও তাই মনে হয়েছিল। এবং স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমি হঠাৎ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। নইলে, আমার তখন যুবক বয়েস, মাঝরাত্রে ঘরের মধ্যে একটি যুবতী মেয়েকে দেখে অন্য কিছুও তো মনে হতে পারত। আমরা যতই শিক্ষিত হই আর কুসংস্কার- মুক্ত হওয়ার বড়াই করি, এক এক সময় আমাদেরও যুক্তিবোধ নষ্ট হয়ে যায়।

মেয়েটির বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশ, ভদ্রঘরের মেয়ে, মোটামুটি সুন্দরীই বলা যায়। একটা কালো রঙের শাড়ি পরে আছে, চুলগুলো সব খোলা, চোখ মুখে রীতিমতন ভয়ের চিহ্ন। মেয়েটি দু-হাত জোড় করে আছে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে। পাগল হতে পারে, কিংবা বিপদে পড়ে কেউ আশ্রয় চাইতে পারে কিন্তু আমি ভয় পেয়েছিলাম কেন জান? মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকল কী করে? আমি তো সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিয়েছি শোওয়ার আগে।

রক্তমাংসের কোনো মানুষের পক্ষে তো দেওয়াল কিংবা দরজা ভেদ করে ঢোকা সম্ভব নয়! দরজাটা খোলা, স্পষ্ট দেখছি একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘরের মধ্যে। এটা কী করে সম্ভব? তবে কি অলৌকিক বা অশরীরী কিছু? আমার গলা শুকিয়ে গেল, হাত-পা কিছুই নড়াতে পারলাম না। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম মেয়েটির দিকে। মেয়েটিও তাকিয়ে আছে সোজাসুজি আমার চোখে। মনে হয়, তার চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বল করছে।

খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম, আর যাই হোক, ভূত নয়, রক্ত মাংসেরই মেয়ে। হয়তো পাগল, কিংবা ডাইনি-জাতীয় কিছু

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে? কে আপনি?

সেই অস্পষ্ট আলোতেও মনে হল মেয়েটির ঠোট কাঁপছে। কিন্তু কিছু বলল না। আমি আবার জোরে জিজ্ঞেস করলাম, কে আপনি?

শুনুন–

মেয়েটি কথা শেষ করল না। হঠাৎ একটা দৌড় লাগাল। দৌড় শুরু করতেই আমি ভেবেছিলাম, ও বুঝি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। নখ দিয়ে আমার চোখ অন্ধ করে...। ভয়ে আমি মুখ ঢেকে ফেলেছি।

মেয়েটি কিন্তু দৌড়ে পাশের ঘরে চলে গেল মাঝখানের দরজা দিয়ে। ওই দরজাও তো আমি বন্ধ করেছিলাম।

ভয়ে আমার বুক রীতিমতন ঢিপঢিপ করছে। কিছুতেই সামলাতে পারছি না নিজেকে। একথাগুলো স্বীকার না করলে মিথ্যে বলা হত। আমি ভীতু লোক নই। কিন্তু সে-দিন ভয় পেয়েছিলাম ঠিকই। মেয়ের বদলে ঘরের মধ্যে পুরুষমানুষকে দেখলে বোধ হয় ভয় পেতাম না। হঠাৎ রিভলবারটার কথা মনে পড়ল। মনে পড়তেই সাহস ফিরে এল কিছুটা।

বালিশের তলা থেকে রিভলবারটা বার করে খাট থেকে নামলাম। প্রথমে আমার পা দুটো কাঁপছিল খুব। আস্তে আস্তে সেটা কমল। একবার ইচ্ছে হল, কোনোরকমে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়ি। কিন্তু আবার এটাও অনুভব করলুম, মনের এই ভীরুতা না কাটাতে পারলে সারাজীবন একটা লজ্জা থেকে যাবে। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত দেখা দরকার। একটা রক্ত-মাংসের মেয়েই তো-তাকে এতটা ভয় পাওয়ার কী আছে? হ্যাজাকটা বাড়িয়ে দিয়ে সেটা বাঁ-হাতে নিয়ে এলাম পাশের ঘরে।

মেয়েটি সেই ঘরেই অপেক্ষা করছিল, আমি খাট থেকে নেমে দু-এক পা এগোতেই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, সে দৌড়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। ওখানে দাঁড়িয়ে সে লক্ষ করছিল আমাকে। ওঘরের দরজাও খোলাই ছিল, কেননা আমি ছিটকিনি খোলার শব্দ পাইনি। শুধু দরজার একটা পাল্লায় আওয়াজ হল দড়াম করে।

পাশের ঘরে এসে আমি চুপ করে দাঁড়ালাম। তক্ষুনি বাইরে না বেরিয়ে দেখতে লাগলাম দরজাগুলো। কোনো দরজাই ভাঙা নয়। তা হলে ছিটকিনি খুলল কী করে? আমি প্রত্যেকটা বন্ধ করেছি। না কি করিনি? অনেক সময় বেশি সাবধানি হতে গেলে আসল ব্যাপারেই ভুল হয়ে যায়। আমি যে একবার বাইরে গিয়েছিলাম—তারপর ভেতরে ঢুকে আর দরজা বন্ধ করিনি? তা প্রায় অসম্ভব বলা যায়। অথচ মেয়েটি ঢুকল কী করে ভেতরে? দরজা না-ভেঙে বা দেওয়াল ভেদ করে তো কেউ ঘরে ঢুকতে পারে না। কিংবা বাইরে থেকে ছিটকিনি খোলার কোনো উপায় আছে! এই সমস্যার সমাধান আমি আজও করতে পারিনি।

ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়েই আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? কী জন্য এসেছেন? বাইরে থেকে কোনো উত্তর এল না। কোনো শব্দও নেই। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা অলৌকিক বলেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। তখন আমার উচিত ছিল ভালো করে দরজা জানলা আবার বন্ধ করে এসে শুয়ে পড়া। মন থেকে ব্যাপারটা একেবারে মুছে ফেলা।

কিন্তু ওই যে, একবার ধারণা হয়ে গেল, ছিটকিনি বন্ধ থাকা সত্ত্বেও দরজা দিয়ে মেয়েটি ঢুকেছে, তা হলে তো আবার বন্ধ করলে আবার ঢুকতে পারে। কোনো রক্ত-মাংসের মানুষের পক্ষে যে, বন্ধ দরজা না ভেঙে কিংবা দেওয়াল ভেদ করে আসা সম্ভব নয়, এই যুক্তিবোধটা আমার দুর্বল হয়ে গিয়েছিল।

আমি বাইরের বারান্দায় চলে এলাম। সেখানেও কেউ নেই। তবু আমি চিৎকার করলাম, কে, কে ওখানে?

কোনো সাড়া নেই। তখন আমার চোখ পড়ল আমার গাড়িটার ঠিক পেছনেই আর একটা জিপগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অস্পষ্ট অন্ধকারে আগে সেটা আমি দেখতে পাইনি। তাহলে তো আর অলৌকিক বলে মনে করা যায় না। একটা জলজ্যান্ত জিপগাড়ি তো সত্যিই দাঁড়িয়ে আছে। এবং গাড়ি যখন আছে তাতে নিশ্চয়ই কেউ এসেছে।

বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে দু-এক পা নেমে গিয়ে দেখলাম জিপগাড়িটা খালি, ভেতরে কেউ নেই। যারা এসেছে, তারা গেল কোথায়? কোনো সাড়াশব্দ নেই কেন? ডান দিকে তাকিয়ে দেখলাম, চৌকিদারের ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। বেশ চেঁচিয়ে ডাকলাম, চৌকিদার, চৌকিদার!

চৌকিদার তো আগেই বলে রেখেছে যে, সে কানে শুনতে পায় না। সুতরাং তার সাড়া না দেওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু চৌকিদারের ঘরে নিশ্চয়ই অন্য কেউ-না-কেউ আছে। আমি প্রথম যখন দরজা ধাক্কা দিয়েছিলাম, তখন ওর দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। ওর বউ-টউ হতে পারে। কিন্তু সে তত শুনতে পারে আমার চিৎকার। সে ডেকে দিতে পারছে না? এতরাত্রে ওর ঘরে আলো জ্বলছেই-বা কেন?

জিপগাড়িটার কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য আমি এসেছিলাম। এমন সময় মনে হল জিপগাড়িটার পেছন থেকে কিছু একটা শব্দ হল। এই প্রথম আমি অন্যভাবে সতর্ক হয়ে উঠলাম। জিপ গাড়িটার পেছনে কেউ লুকিয়ে আছে। এবং নিশ্চয়ই কোনো দুষ্টু বদমাইশ লোক। আমার ডাকে যখন সাড়াও দিচ্ছে না তখন ওদের কুমতলব থাকাই স্বাভাবিক।

আমার হাতে রিভলবার ছিল, কিন্তু ওরা জিপের পেছন থেকে খুব সহজেই আমাকে গুলি করতে পারে। আমি মাথা নীচু করে তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম ঘরের মধ্যে। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কে? কথা বলছেন না কেন?

এবারও কেউ সাড়া দিল না। এই সাড়া না দেওয়ার ব্যাপারই আমার কাছে সবচেয়ে অস্বাভাবিক লাগছিল। চৌকিদারকে ডেকেও সাড়া পাওয়া গেল না। মাঝরাত্রে যারা জিপে

করে আসে, তারাও সাড়া দেয় না। কিন্তু ওদের যদি চুরি-ডাকাতির মতলব থেকে থাকে– তাহলে আমি যখন বাইরে বেরিয়েছিলাম, তখন ওরা আমাকে সহজেই ঘায়েল করতে পারত। একলা মেয়েটাকে প্রথম ঘরের মধ্যে পাঠিয়ে আমাকে বাইরে টেনে এনেছে।

যাই হোক, এরা ডাকাত হলেও আমাকে একাই আত্মরক্ষা করতে হবে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, চৌকিদারের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না। খালের ওপারে কয়েকটা ঘরবাড়ি আছে বটে, কিন্তু এখান থেকে চ্যাঁচালেও তারা শুনতে পাবে না। কিংবা শুনতে পেলেও সাহায্য করতে আসবে কি না সন্দেহ। সাধারণত কেউ আসে না।

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে নজর রাখলাম জিপগাড়িটার ওপর। গাড়িটার পেছনে মানুষের নড়াচড়া আর ফিসফাস কথা শোনা যাচ্ছে একটু একটু। ওরা ক-জন আছে? সেই মেয়েটাও গিয়ে ওখানে লুকিয়েছে? মেয়েটাকে দেখে আর যাই হোক, ডাকাত দলের সঙ্গিনী বলে মনে হয়নি। বরং ওর মুখে বেশ একটা ভয়ের চিহ্ন দেখেছিলাম, আমাকে কিছু একটা বলতেও চেয়েছিল। শুনুন বলেই আর শেষ করতে পারেনি, ছুটে পালিয়েছে। কী ওদের মতলব? যদি ডাকাত হয়, তাহলে আমাকে আক্রমণ করার সুযোগ পেয়েও ওরা ছেড়ে দিল কেন? আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছে না কেন? কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়!

দরজার ছিটকিনিটা খিল লাগিয়ে দিলাম। সে-ঘরের খাটখানা এনে ঠেকিয়ে দিলাম দরজার সঙ্গে। তারপর চলে এলাম পাশের ঘরে। মাঝখানের দরজাটা বন্ধ করে টেবিলটা টেনে এনে সেখানে আটকে দিলাম। বাথরুমের দরজাটার সামনে পর পর দাঁড় করিয়ে দিলাম দুটো চেয়ার। আমার কাছে চব্বিশটা বুলেট আছে। যদি কেউ দরজা ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করে, তাহলে বেশ কিছুক্ষণ লড়াই করা যাবে। অন্তত দু-একজন ঘায়েল না হয়ে আমাকে কিছু করতে পারবে না।

ওইসব চেয়ার-টেবিল টানাটানি করার সময় আমার সবচেয়ে বেশি রাগ হচ্ছিল চৌকিদারটার ওপর। ওর সঙ্গে নিশ্চয়ই ডাকাতদলের যোগসাজস আছে। কিন্তু তাহলে

আবার ও আমাকে এই ডাকবাংলোয় থাকতে বারণ করেছিল কেন? এতরাত্তিরে ওর ঘরে আলোই বা জ্বলছে কেন? চৌকিদারের ব্যবহারটাই বেশি রহস্যময়। যাইহোক, তখন কিন্তু আমার আর সেরকম ভয় করছিল না। আমি রীতিমতন যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছিলাম।

বাইরের দিকে দরজাটা সবচেয়ে ভালোভাবে গার্ড করা দরকার। এঘরে দুটো খাট আছে। দুটো খাটকেই টেনে এনে যদি দরজার সঙ্গে দিয়ে দেওয়া যায়—তাহলে অনেকটা দুর্গের মতো হবে।

বিছানাটা পাট করে রেখে আমি একটা খাট প্রথমে টেনে সরাতে গেলাম। একটু সরাতেই দেখলাম, তলায় একটা ডেডবডি!

মাধবী চেঁচিয়ে উঠল, কী?

কর্নেল সেন নির্লিপ্তভাবে বললেন, একটা ডেডবডি। একজন পুরুষমানুষ, বছর তিরিশেক বয়েস। পাজামা ও পাঞ্জাবি পরা, সুপুরুষ বলা যায়—মেঝেতে একটা চাদর পেতে তার মৃতদেহটি শোয়ানো, রক্ত-টক্ত কিছু নেই—সব ধুয়েমুছে পরিষ্কার করা, লোকটির চোখ চেয়ে আছে—হঠাৎ দেখলে তাকে মৃত বলে মনে হবে না। কিন্তু আমি তো ডাক্তার মানুষ, আমি এক পলক তাকিয়েই তার মুখে মৃত্যুর চিহ্ন দেখতে পেলাম। তখন আমি বুঝতে পারলাম, কেন একটু আগে ঘরের মধ্যে ডেটলের গন্ধ পাচ্ছিলাম। রক্ত-উক্ত সব ধুয়ে ডেটল দিয়ে ঘর মোছা হয়েছে। লোকটির জামা-টামা তখনও ভিজে ভিজেবুলেটের গর্তটা ঠিক বুকের মাঝখানে নয়, গলার কাছে। যে তাকে মেরেছে, সে রিভলবার চালানোয় খুব অভিজ্ঞ নয়। কিংবা হয়তো ধস্তাধস্তি হয়েছিল।

খাটটা সরিয়েই সেই মৃতদেহটা দেখতে পেয়ে আমি দু-এক মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

রঞ্জন বলল, ব্যাস। এখন এই পর্যন্ত!

আমি রঞ্জনের মুখের দিকে তাকালাম।

মাধবী জিজ্ঞেস করল, তার মানে?

রঞ্জন বলল, তোমার তো ঘুম পেয়ে গেছে। গল্পটা আজ এই পর্যন্ত থাক। আবার কাল শুনবে।

মাধবী সোজা হয়ে বসে চোখ বড় বড়ড়া করে বলল, আমার ঘুম পেয়েছে? তোমাকে বলেছে। এখন কেউ ঘুমোতে পারে?

রঞ্জন হাসতে হাসতে বলল, এইরকম দারুণ সাসপেন্সের জায়গায় গল্প থামিয়ে দিলে কী চমৎকার হবে বলো তো! শুয়ে শুয়ে সারারাত তারপর কী হল, তারপর কী হল ভাববে! আসল গল্পের চেয়েও নিজের মনে মনে অনেক গল্প তৈরি হবে! সেটাই ভালো না?

মাধবী ধমকে উঠল, তুমি চুপ করো তো! বড় বাজে বকো! এই পর্যন্ত শুনে বাকিটা কেউ শুনে পারে? সেই মেয়েটা কোথায় গেল?

রঞ্জন আমার দিকে ফিরে বলল, তুই কী বলিস সুনীল? আজ এই পর্যন্ত থাক? নাহলে সারারাত কেটে যাবে। মামাবাবুকে তো বিশ্রাম দেওয়া উচিত।

কর্নেল সেন চুপ করে বসে আছেন। আমি বললাম, তার চেয়ে এক কাজ করলে হয়। মাধবী বরং একটু কফি বানাক! এখন একটু গরম হলেই জমবে। নাহয় সারারাত জাগা হবে আজ! কর্নেল সেন। আপনার আপত্তি আছে?

কর্নেল সেন বললেন, কিছুমাত্র না। কফির আইডিয়াটা খুব ভালো। এখন একটু গরম কফি পেলে মন্দ হত না!

রঞ্জন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, তাই তোক তবে। মাধবী উঠে পড়ো!

মাধবী আমার দিকে তাকিয়ে ভঙ্গি করে বলল, খালি আমাকে খাটানো, এতরাত্রে রান্নাঘরে ঢুকতে আমার ভয় করছে!

২. বৃষ্টি থামেনি, সমানে পড়ছে

বৃষ্টি থামেনি, সমানে পড়ছে। রাস্তাঘাট সব থই থই। মনে হচ্ছে আজ রাত্রেই কলকাতা প্লাবনে ডুবে যাবে। কাল সকালেও বাড়ি থেকে বেরোনো যাবে কি না সন্দেহ। আজকের রাত্তিরটা গল্প জমাবার পক্ষে চমৎকার। কফির কাপ হাতে নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ জানলা দিয়ে বাইরে বৃষ্টির দৃশ্য দেখলাম।

কফি শেষ হওয়ার পর কর্নেল সেন চুরুট ধরালেন। আমি আর রঞ্জনও সিগারেট জ্বেলে নিলাম। মাধবীর আর তর সইছিল না, ব্যথভাবে বলল, এইবার বলুন, তারপর কী হল?

কর্নেল সেন বললেন, ওই অবস্থায় ওইরকম পরিবেশে খাটের তলায় হঠাৎ একটা ডেডবডি দেখতে পেলে অন্যদের পক্ষে খুব ভয় পাওয়ার কথা। আমিও দু-এক মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম বটে, কিন্তু ওটা দেখার পর আমার বরং ভয়টা একেবারেই কেটে গেল। আগে যে, অলৌকিক কিছু-বা ভূত-টুত সম্পর্কে মনের মধ্যে একটু ছমছমে ভাব হয়েছিল, সেটা আর রইল না। আমি ডাক্তার মানুষ, আমার কাছে ডেডবডি একটা রিয়ালিটি। অর্থাৎ একটা মানুষের মৃতদেহ দেখলেই মনে হয় যে, তার মৃত্যুর একটা কারণ আছে। সে কিছুক্ষণ আগে বেঁচে ছিল। একটা মৃতদেহ হঠাৎ দেওয়াল ভেদ করে আসে না বা হঠাৎ উবে যায় না।

তখন গুণ্ডা বদমাইশদের চিন্তাই আমার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল। মৃতদেহটার দিকে আর মনোযোগ না দিয়ে আমি খাটটা টেনে এনে দরজার সঙ্গে লাগিয়ে দিলাম। রিভলবারটা হাতে তৈরি রেখে দেখতে লাগলাম, আর কোনোদিক থেকে কেউ ঢুকতে পারবে কি না। একটা জানলা আছে, কিন্তু সেই জানলাটা ভেঙে ফেলা অসম্ভব নয়। আর জানলাটা একটু উঁচুতে বলে, সেটার সামনে অন্য কিছু রাখারও উপায় নেই। আমি তখন জানলার পাশে গিয়েই দাঁড়ালাম। জানলা ভেঙে যদি কেউ ঢোকার চেষ্টা করে, তাহলে প্রথমেই আমি

গুলি করব। ওদের লোকসংখ্যা যদি খুব বেশি না হয়, তাহলে সারারাত আমি লড়ে যেতে পারব।

বেশ কিছুক্ষণ আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। মাঝরাত্তিরে এক জায়গায় একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেই ক্লান্ত লাগে। কিন্তু আমাকে ক্লান্ত হলে চলবে না, সারারাতই এইরকম দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। বেশ বুঝতে পারলাম, এই নির্জন বাংলোয় একটা হত্যাকান্ড হয়ে গেছে। খুব সম্ভবত কাল রাত্রে। দিনের বেলা ওরা ডেডবডিটা সরাবার সুযোগ পায়নি–এখন সেটা সরাতে এসেছে। অর্থাৎ একটা বিশ্রী খুনের ঘটনা, এরমধ্যে একটি মেয়েরও ভূমিকা আছে। যারা একরাত্রে কারুকে খুন করে পরের রাত্তিরে ডেডবডি সরাতে আসে, তারা সাংঘাতিক লোক। মাঝখান থেকে হঠাৎ আমি এসে এরমধ্যে জড়িয়ে পড়েছি। জড়িয়ে তো পড়েছি, এখন এরমধ্যে থেকে বেরোবো কী করে, সেটাই হচ্ছে সমস্যা।

ওদিক থেকে আর কোনো শব্দ-টব্দ না পেয়ে আমি মৃতদেহটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলাম। ডাক্তার মানুষ তো, এটা আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে। চোখের সামনে এ-রকম একটা ডেডবডি পড়ে থাকলে পরীক্ষা না করে দেখা পর্যন্ত শান্ত হতে পারি না। সব দেখেশুনে মোটামুটি নিশ্চিন্ত হলাম।

মাধবী জিজ্ঞেস করল, মামাবাবু, সত্যি কথা বলুন তো, তখন আপনার ভয় করছিল না? ঘরের মধ্যে একটা মড়া–

কর্নেল সেন বললেন, না, মড়া দেখে ভয় পেলে আমাদের চলে না। তবে ঘরের বাইরে জ্যান্ত লোকগুলো সম্পর্কেই ভয় পাচ্ছিলাম।

সেই মেয়েটার কী হল? তার আর কোনো পাত্তা পেলেন না?

কর্নেল সেন বললেন হ্যাঁ পেলাম। একটু বাদে জানলায় একটা শব্দ হতেই আমি চট করে উঠে এসে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালাম। মনে হল কেউ যেন জানলার খড়খড়ি তোলার চেষ্টা

করছে। আমি গম্ভীরভাবে বললাম, আমার কাছে রিভলবার আছে, জানলা খোলার চেষ্টা করলেই আমি গুলি করব!

তখন সেই মেয়েটির গলা শুনতে পেলাম। সে বলল, শুনুন!

এখন আর তাকে আমি পেতনি-টেতনি ভাবতে পারছি না। সুতরাং ভয় না পেয়ে বললাম, বলুন।

দরজাটা একটু খুলবেন?

না। আপনারা কে?

ঘরের মধ্যে যে-দেহটা আছে, আমি সেটা নিয়ে যেতে এসেছি।

আপনার সঙ্গে আর কে আছে?

কেউ নেই। আমি একা–

আপনি একা তো এই ডেডবডি নিয়ে যেতে পারবেন না।

আপনি একটু সাহায্য করবেন। সঙ্গে আমার জিপ আছে।

এটা বুঝতে আমার একটুও অসুবিধে হল না যে, মেয়েটির সঙ্গে অন্য লোক আছে। একজন বা তারও বেশি। তাদের নড়াচড়ার শব্দও আমি শুনতে পেয়েছি। কিন্তু ওরা মেয়েটিকে প্রথমে এগিয়ে দিচ্ছে বিশেষ কারণে। চৌকিদারের কাছ থেকেই হোক বা আমার গাড়িটা থেকেই হোক-ওরা বুঝতে পেরেছিল যে আমি মিলিটারির নোক। সুতরাং আমার কাছে বন্দুক, রিভলবার থাকবেই। ওরা এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারেনি যে, আমি একজন ডাক্তার। যাইহোক, ওরা ভেবেছে, মিলিটারির লোক সাধারণত মাথাগরম হয়। ওদের মধ্যে কোনো পুরুষকে সামনে দেখতে পেলে প্রথমেই হয়তো আমি গুলি করতে

পারি। একটি মেয়েকে দেখলে আর যাইহোক, প্রথমেই কোনো পুরুষমানুষ গুলি ছুড়তে পারে না।

যেকোনো উপায়েই হোক, আমার ঘরের দরজা খুলে ওরা মেয়েটিকে ভেতরে পাঠিয়েছিল। মেয়েটি একলাই বোধ হয় ডেডবডিটা টেনে নিয়ে যেত, তার আগে সে দেখে গিয়েছিল, আমি জেগে আছি কি না। সেই সময় তার চুল এসে লেগেছিল আমার মুখে।

যাইহোক, আমি জেগে ওঠবার পর, মেয়েটি যদি খুব কান্নাকাটি করে কোনো একটা মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলত, আমি হয়তো বিশ্বাসও করে ফেলতাম। আমার তখন যা বয়েস, সেই বয়সের ছেলেরা যুবতী মেয়েদের কথা সহজেই বিশ্বাস করতে চায়। বিশেষত মেয়েদের চোখের জল দেখলে তো কথাই নেই। কী, ঠিক বলছি না?

মেয়েটা যদি কান্নাকাটি করে একটা রোমহর্ষক গল্প বানিয়ে বলতে পারত তাহলে ওকে হয়তো আমি সাহায্যও করতে পারতাম। একা কোনো মেয়ে বিপদে পড়লে, লোকে কিছুটা অন্যায়ের ঝুঁকি নিয়েও তাদের সাহায্য করতে চায়। কিন্তু মেয়েটি তার পার্ট ভালো করে প্লে করতে পারেনি। ঘরের মধ্যে ওকে যখন আমি দেখলাম, তখন ও দেওয়াল ঘেঁষে হাতজোড় করে বলেছিল, শুনুন–। তারপর কথা শেষ করতে পারেনি, দৌড়ে পালিয়ে যায়। তখনই আমি সাবধান হয়ে গেলাম।

এখনও, জানলার ওপাশে দাঁড়িয়ে মেয়েটি ভালো করে অভিনয় করতে পারছে না। কথা বলতে গিয়ে থেমে যাচ্ছে। কেউ যেন পাশে থেকে তাকে শিখিয়ে দিচ্ছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে?

য়েটি বলল, সে-কথা আপনার জেনে দরকার নেই। আমার স্বামী হঠাৎ আত্মহত্যা করেছেন। আমি তাঁর ডেডবডিটা নিয়ে যেতে এসেছি।

আত্মহত্যা করলেও পুলিশে খবর দিতে হয়। খবর দিয়েছেন?

আপনি এরমধ্যে জড়াবেন না। আপনি দরজাটা খুলে দিন! আমি ওকে নিয়ে যাই। তারপর আপনার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

আমি তখন বললাম, ঠিক আছে, বাইরে সারারাত অপেক্ষা করুন। সকাল বেলা দেখা যাবে কী করা যায়।

মেয়েটি আবার বলল, আপনি শুধু শুধু ব্যাপারটা জটিল করছেন। আমি ডেডবডিটা নিয়ে গেলে আপনার কথা কেউ জানতেও পারবে না।

কর্নেল সেন একটু থামলেন। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, তোমরাই বলো তো, তখন আমার কী করা উচিত ছিল? আমার কি দরজা খোলাই উচিত ছিল?

রঞ্জন বলল, নিশ্চয়ই না। ওইরকম অবস্থায় দরজা খোলা তো পাগলামি। খুনের ব্যাপারে আপনি একজন সাক্ষী হয়ে গেলেন। ওরা আপনাকেও শেষ করার চেষ্টা করত। মেয়েটাকে আড়াল করে লোকগুলো ঢুকত, ওদের কাছেও রিভলবার বা বন্দুক নিশ্চয়ই ছিল। কারণ খুনটা হয়েছিল গুলি করে। এমনকী মেয়েটাও আপনাকে গুলি করতে পারত। মেয়েদের বেশি ভালো ভাবার তো কোনো কারণ নেই!

মাধবী বলল, কিন্তু মামাবাবু, আপনাকেও তো ওরা জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করতে পারত। ওরা যদি তখন পালিয়ে গিয়ে গোপনে পুলিশে খবর দিত—তা হলে পুলিশ এসে দেখত ঘরের মধ্যে আপনি একা আর একটা ডেডবডি—

কর্নেল সেন বললেন, মাধবী, তুমি এক বিষয়ে ঠিকই বলেছ। যেকোনো সাধারণ লোক ওই অবস্থায় পড়লে ওইরকম ভাবতে পারত। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ, আমি একজন ডাক্তার। এইসব ক্ষেত্রে ডাক্তারদের চিন্তাভঙ্গি একটু অন্যরকম হয়। মৃতদেহটি পরীক্ষা করেই আমি বুঝেছিলাম, লোকটিকে খুন করা হয়েছে অন্তত ১৬ থেকে ২০ ঘণ্টা আগে। পোস্টমর্টেমে সেটা ধরা পড়বেই—তখন মৃত্যুর সময়টা আরও নির্ভুলভাবে বলা যায়। ১৬

থেকে ২০ ঘণ্টা আগে আমি ছিলাম ওই ডাকবাংলো থেকে অনেক দূরে। সেটা প্রমাণ করতে কোনো অসুবিধে হবে না। সুতরাং খুনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার ভয় আমার ছিল না। আমার ভয় ছিল আমি নিজেই-না, খুন হয়ে যাই।

আমি মেয়েটিকে বললাম, আমি দরজা এখন কিছুতেই খুলব না। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, তারপর দেখা যাবে।

মেয়েটি আর কোনো উত্তর দিল না। আমি শুনতে পেলাম সে ফুপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বেশ কিছুক্ষণ কান্নার পর সে ধরা গলায় বলল, আপনার কাছে আমি ভিক্ষে চাইছি। আপনি আমাকে এইটুকু সাহায্য করবেন না? আমার স্বামীর দেহটা আমাকে নিয়ে যেতে দিন।

আমি এখন আর মেয়েটির অভিনয়ে ভুললাম না। রুক্ষ গলায় বললাম, আপনার স্বামীর দেহ কী কার দেহ, সেসব আমি কিছু জানি না। সকাল বেলা বোঝা যাবে। এখন আমি দরজা খুলব না।

এতক্ষণ বাদে একজন পুরুষের কথা শুনতে পাওয়া গেল। আমাকে ভয় দেখিয়ে বললে, আপনি যদি না খোলেন, আমরা দরজা ভেঙে ঢুকব।

তখন আমার ভয় পাওয়ার কোনো মানে হয় না। আমিও ভয় দেখিয়ে ধমক দিয়ে বললাম, প্রথম যে ঢুকবে, তার নির্ঘাত মরণ আছে আমার হাতে। সে চেষ্টা না করাই ভালো!

পুরুষটি আবার বলল, আপনি কেন এরমধ্যে মাথা গলাচ্ছেন? দরজা খুলে দিন, আমাদের জিনিস আমরা নিয়ে চলে যাই। আপনি চুপচাপ ঘুমোবেন, আপনার কেউ কোনো ক্ষতি করবে না।

আমি বললাম, কাল সকালের আগে কিছু হবে না। সকালের আগে আমি দরজা খুলব।

পুরুষটি যদিও বাংলায় কথা বলছিল, কিন্তু টান শুনলেই বোঝা যায় সে বাঙালি নয়। মেয়েটি কিন্তু খাঁটি বাঙালি। মৃতদেহটা যার, সেও বাঙালিই। ব্যাপারটা আমার কাছে ক্রমশই জটিল হয়ে উঠছিল। যাইহোক, আমার কথা শুনে লোকটি আর কিছু বলল না।

তারপর আবার চুপ! মনে হল, একটু বাদে কেউ যেন, নেমে গেল বারান্দা দিয়ে। আবার কেউ যেন ফিরে এল। আবার চুপচাপ। আমি উৎকণ্ঠ হয়ে রইলাম, সামান্য শব্দও যেন আমার কান না-এড়ায়। কিন্তু মনে হল, জানলা বা দরজা ভাঙার চেষ্টা আপাতত ওরা ত্যাগ করেছে। ওরা অপেক্ষা করছে আমার কোনো দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নেওয়ার জন্য। এমনিভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল।

শেষপর্যন্ত আমি কী করলাম জাননা? শুনলে বোধ হয় তোমরা বিশ্বাসই করবে না। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম!

মাধবী আঁতকে উঠে বলল, অ্যাঁ? ঘুমিয়ে পড়লেন? ওই অবস্থায়?

কর্নেল সেন বললেন, কী করব। ঘুমের ওপর কী কারুর হাত আছে? ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে আমি একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। আমার শরীরটাও সে-দিন বিশেষ ভালো ছিল না। ঘুমে চোখ টেনে আসছিল। দাঁড়িয়ে থাকতে আর না পেরে, আমি দেওয়াল ঘেঁষে বসে পড়েছিলাম। তারপর কখন যে একফাঁকে ঘুমিয়ে পড়েছি, খেয়াল নেই। ঘরের মধ্যে একটা মড়া, বাইরে কতকগুলো গুণ্ডা বদমাইশ। তার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

রঞ্জন বলল, ব্যাস এই পর্যন্ত। এবার চলো, আমরাও ঘুমিয়ে পড়ি। মাধবী রেগে গিয়ে বলল, তুমি চুপ করো তো! তোমার যদি ঘুম পেয়ে থাকে তো তুমি যাও। আমরা শুনব। তারপর কী হল মামাবাবু?

রঞ্জন বলল, আমার একটুও ঘুম পায়নি। কিন্তু গল্প খুব জমে উঠলে আমার মনে হয়, শেষ হলেই তো ফুরিয়ে যাবে। ভালো বই যে-কারণে আমি তারিয়ে তারিয়ে পড়ি। আজ

এই পর্যন্ত শোনা হল, আবার কাল সকালে বাকিটা শুনব। নাহলে কাল সকালে কী করব? যা বৃষ্টি কাল সকালে তো বেরোনো যাবে না।

মাধবী বললে, কাল সকালে সুনীলদা গল্প বলবে। আজ রাত্তিরে আমরা এটা শেষ পর্যন্ত -শুনে শুতে যাব না।

কর্নেল সেন মুচকি হেসে বললেন, এটা শেষ হতে হতে কিন্তু সারারাত কেটে যেতে পারে।

তা হোক। একটুও ঘুম পাচ্ছে না।

আমি রঞ্জনকে বললাম, ভাই, আমারও নেশা লেগে গেছে। এখন এই পর্যন্ত শুনে আর থাকা যায় না। ডিটেকটিভ বই পড়তে পড়তে আমি অনেক রাত কাবার করে দিই!

কর্নেল সেন বললেন, ডিটেকটিভ বইয়ের মতন এ-গল্পে সেরকম কোনো জটিল প্লট অবশ্যই নেই! পরে যখন কেস উঠল–

রঞ্জন তার মামাবাবুকে বাধা দিয়ে বলল, শেষের কথা এখন বলবেন না। আপনি পর পর বলুন। ঘুমিয়ে পড়লেন, তারপর কী হল?

৩. কর্নেল সেন আবার হেসে

কর্নেল সেন আবার হেসে মাধবীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তারপর আর কী? আসলে গল্পটা বেশি বড়ো নয় মোটেই। এক্ষুনি শেষ হয়ে যাবে। বসে বসে সেই যে ঘুমিয়ে পড়লাম, তারপর আর কিছু মনে নেই। এরমধ্যে ওরা জানলা ভেঙে ঢুকে আমাকে মেরে ফেলতে পারত। কিংবা জানলা ভাঙার শব্দে আমি হয়তো জেগে উঠতাম। সেসব কিছুই হয়নি। ঘুম ভাঙতেই ধড়মড় করে উঠে বসলাম। দেখলাম যে, রীতিমতন সকাল হয়ে গেছে; গল্প এখানেই শেষ। এবার ঘুমোতে যেতে পারো!

মাধবী সবিস্ময়ে বলল, গল্প শেষ মানে? মড়াটার কী হল? নেই?

কর্নেল সেন বললেন, মড়াটা ভূত হয়ে পালায়নি। সেটা তখনও সেখানেই পড়ে আছে। কিন্তু এরপর তো পুলিশ-টুলিশের ব্যাপার। আমি ডাকবাংলোর অভিজ্ঞতার কথা বলব বলেছিলাম। সে-গল্প এখানেই শেষ। ডাকবাংলোয় এ-রকম রোমাঞ্চকর রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা তোমাদের কখনো হয়েছে? ডাকাতের সঙ্গে শেষপর্যন্ত গুলি ছোড়াছুড়ি করতে হয়নি অবশ্য, কিন্তু গোটা রাত অজানা অচেনা এক লোকের মৃতদেহের সঙ্গে একঘরে কাটিয়েছিলাম। ঘরের বাইরে কয়েকজন রহস্যময় নারী-পুরুষ। তারপর আবার আমার ঘুম। এ-রকম রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা কি সচরাচর মানুষের হয়? এইটুকুই গল্প। এরপর থানা পুলিশ, আইনের ব্যাপার-তারমধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই।

মাধবী বলল, না মামাবাবু, ওসব চলবে না। তারপর কী হল বলুন।

রঞ্জন বলল, তারপর আর কী? গল্প তো শেষ হয়ে গেছে। এই গল্পের নাম এক রাত্রির অভিজ্ঞতা। তুমি বাচ্চামেয়ের মতন তারপর তারপর জিজ্ঞেস করছ কেন? বাচ্চারাই তো গল্প শেষ হওয়ার পরও জিজ্ঞেস করে তারপর কী হল!

মাধবী এত চটে গেছে যে, চটাস করে এক চড় বসাল স্বামীকে।

আমিও আর ধৈর্য রাখতে পারছিলাম না। কর্নেল সেনকে জিজ্ঞেস করলাম, গল্প তো শেষ হয়ে গেল। কিন্তু আপনি ওঘর থেকে বেরোলেন কী করে? ওরা তখনও ছিল না বাইরে?

কর্নেল সেন চুরুটের ছাই ঝেড়ে বললেন, আমি অনেকক্ষণ দরজা খুলিনি। তারপর জানলার খড়খড়ি তুলে দেখলাম, দেখতে পেলাম না কাউকে। জিপটাও নেই, তবে আমার গাড়িটা ঠিকই আছে। মনে হল ওরা চলে গেছে।

দিনের আলোয় মৃতদেহটা ভালো করে দেখলাম। লোকটি বিশেষ যন্ত্রণা পেয়ে মরেনি, গুলি লাগার সঙ্গেসঙ্গেই প্রাণ হারিয়েছে। তার মুখেচোখে একটা বিস্ময়ের ছাপ—যেন মৃত্যুর জন্য সে তৈরি ছিল না। রিভলবার বা বন্দুকের গুলি তার গলার কাছ দিয়ে ঢুকে ব্রেনের দিকে চলে গেছে। চেহারা দেখলে মনে হয়, লোকটি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের। টাকাপয়সার জন্য কেউ তাকে খুন করেছে—এমন মনে হয় না। যে-মেয়েটি কাল রাত্তিরে এসেছিল, সে কি সত্যিই এর স্ত্রী?

ডাকবাংলোরই একটা সাদা চাদর দিয়ে মৃতদেহটি ঢেকে দিলাম। তারপর সাবান-টাবান নিয়ে আমি ঢুকলাম বাথরুমে। বাইরে তখনও কোনো সাড়াশব্দ নেই।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দরজা খুললাম। ওরা আশেপাশে লুকিয়ে থাকতেও পারে। হয়তো আমাকে ঘর থেকে বার করার জন্য প্রলোভন দেখাচ্ছে। কিন্তু আমিই-বা কতক্ষণ ঘরের মধ্যে বন্দি থাকব?

তখন সকাল প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে গাড়ি যাচ্ছে টের পাচ্ছি। দিনের আলোয় অতটা ভয় করে না। রিভলবারটা পকেটে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

কেউ কোথাও নেই। বাংলোটার চারপাশ ঘুরে দেখলাম ভালো করে। আর কোনো লুকোনো জায়গা থাকা সম্ভব নয়। রাত্রির আগন্তুকদের তো খুঁজে পাওয়া গেলই না, চৌকিদারটারও কোনো পাত্তা নেই। তার ঘরের দরজাটা খোলা। ভেতরে জিনিসপত্তর পড়ে আছে, কিন্তু তার কোনো চিহ্ন নেই কোনোখানে। গতকাল যখন আমি তার ঘরের

দরজা ঠেলেছিলাম, তখন দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। অর্থাৎ তার বউ-টউ কেউ ছিল। দু জনেই সকাল বেলা উঠে কোথায় গেল? পালিয়েছে?

কাল সন্ধ্যের পর থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। খিদেয় পেট চিনচিন করছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমার চা খাওয়া অভ্যেস। চায়ের তেষ্টায় মরে যাচ্ছি। কী করব, কিছুই ভেবে পেলাম না।

সবচেয়ে সহজ কাজ ছিল অবশ্য আমার জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিয়ে আমার গাড়িতে উঠে চম্পট দেওয়া। তাই না?

রঞ্জন বলল, সেটা আপাতত খুব সহজ মনে হলেও আসলে খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়। পরে ধরা পড়লে অনেক বেশি গুরুতর অভিযোগ–

কর্নেল সেন বললেন, কিন্তু পরে ধরা পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তোমরা ডিটেকটিভ বইতে পড়, ছোটোখাটো সূত্র ধরে পুলিশ চটপট এক একজনকে গ্রেফতার করে ফেলে। আসলে কি তাই হয়? শুধু আমাদের দেশে কেন, বিদেশেও সব সময় হয় না। আমি যদি সকাল বেলা উঠে সেই বাংলো থেকে সরে পড়তাম, তাহলে আর আমার খোঁজ পাওয়ার সাধ্য ছিল না কারুর। আমাকেও কোনো ঝামেলায় পড়তে হত না। ওই খুনের কোনো কিনারা হত কি না তাও সন্দেহ। আশেপাশে কত ফাঁকা জায়গা–আততায়ীরা যদি রাত্রির অন্ধকারে ডেডবডিটা সরিয়ে মাঠের মধ্যে কোথাও গভীর গর্ত করে পুঁতে দেয়–কে আর তার খোঁজ পাবে? টাকা দিয়ে চৌকিদারের মুখ বন্ধ করে রাখা যায়। মাঝখান থেকে আমি এসে পড়াতেই সব গন্ডগোল হয়ে গেল।

আমার বয়েস তখন কম, সেইসময়ে ঝামেলা এড়াবার বদলে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়াতেই বেশি ঝোঁক চাপে। সুতরাং আমি সকাল বেলা উঠে পালিয়ে যাইনি। তা ছাড়া একটা নিয়ম আছে, তুমি যদি হত্যা বা এই ধরনের ক্রাইম সংঘটিত হতে দেখো, তাহলে সঙ্গেসঙ্গে পুলিশকে সেটা জানানো কর্তব্য। না জানালে আইনের চোখে তুমিও অপরাধী। আজকাল

অবশ্য এসব কেউ মানে না—খুনজখম এতবেশি হচ্ছে যে, লোকে দেখলেও চোখ ফিরিয়ে থাকে। কিন্তু আমরা পুরোনো কালের মানুষ, আমাদের এথিকস আলাদা।

বাংলোর ঘরে ফিরে এসে আমি ডেডবডিটা আবার ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলাম। লোকটির পকেটে কাগজপত্তর কিছু নেই। তার পরিচয় জানবার কোনো চিহ্ন রাখা হয়নি। বুলেটটা তার দেহের ভেতরেই রয়েছে। ঘরের মধ্যে তার ব্যবহৃত একটা জিনিসও নেই।

এই রহস্যটার শেষ না জেনে বাংলা থেকে চলে যেতে ইচ্ছে করছে না আমার। গতরাত্রির সেই মেয়েটির পরিচয় জানবার জন্য ভেতরে ভেতরে ছটফট করছিলাম। তা ছাড়া এ-রকম অবস্থায় পড়লে সবারই একটু একটু ডিটেকটিভ হওয়ার সাধ জাগে। ভেবে ভেবেও কোনো কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না। লোকটির সঙ্গে কোনো লাগেজ নেই কেন? ডাকবাংলোয় এসে যদি কেউ ওঠে, বিশেষত স্বামী-স্ত্রী—তাদের সঙ্গে কিছু জিনিসপত্র তো থাকবেই। সেগুলো যদি কেউ সরিয়ে ফেলতে পারে—তা হলে ডেডবডিটাই বা অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখল না কেন; কিংবা ফেলে গিয়েও আবার নিতে আসবে কেন?

ঘর থেকে আবার বাইরে এলাম। কথা বলার মতন একটা লোক পেলে ভালো হত। কিন্তু কেউ নেই ধারে-কাছে। রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে বটে, কিন্তু আমি তো আর হঠাৎ কোনো গাড়িকে জোর করে থামিয়ে বলতে পারি না-ও মশাই, দেখবেন আসুন, এখানে একটা ডেডবডি পড়ে আছে। সুতরাং আমাকেই থানায় খবর দিতে যেতে হবে। থানা কত দূরে তাও জানি না।

ডাকবাংলোর ঘরের তালাচাবি ঘরের মধ্যেই পড়েছিল। সেগুলোর বদলে আমি আমার নিজের সুটকেসের তালাটা ঘরের দরজায় লাগিয়ে দিলাম। অন্য সব দরজাগুলো ভেতর থেকে বন্ধ।

গাড়িতে উঠে ডাকবাংলোর কম্পাউণ্ডটা ছাড়াতেই খালের ওপারে সেই ঘরবাড়িগুলোয় কিছু লোকজনের চিহ্ন দেখা গেল। সেখানে গিয়ে থানার খবরটা জিজ্ঞেস করব কি না ভাবছি, এমন সময় রাস্তার ওপরেই একজন বুড়োমতন লোককে দেখা গেল।

গাড়িতে বসে লোকটিকে ডাকলাম। গ্রাম্য চাষিশ্রেণির মানুষ, মুখে চোখে খুব একটা বুদ্ধির ছাপ নেই। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, থানা কোথায় বলতে পার?

সে হাত তুলে একটা দিক দেখিয়ে দিল।

কত দূরে?

দু-ক্রোশ—তিন ক্রোশ হবে।

দূরত্ব সম্পর্কে গ্রামের লোকদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট। তিন ক্রোশ যখন বলছে—তখন অন্তত মাইল দশেকের কম নয়। আমি তাকে বললাম, চলো, আমার সঙ্গে একটু থানায় চলো–

বলেই বুঝতে পারলাম খুব ভুল করেছি। লোকটি ভয়ার্ত সন্দেহ-মাখা চোখে তাকিয়ে আছে হাঁ করে। গ্রামের লোক সাধারণত থানার নাম শুনলেই ভয় পায়-তারপর তাকে বিনা দোষে থানায় যেতে বলা! লোকটি আর কোনো কথা না বলে হনহন করে চলে যাচ্ছিল, আমি তাকে ডেকে বললাম, এই যে, শোনো শোনো- । তোমাকে থানায় যেতে হবে না। একটা কথা শোনো!

পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বার করে লোকটির হাতে দিয়ে বললাম, তুমি একটা কাজ করতে পারবে ভাই? আমি যতক্ষণ না ফিরি, তুমি ওই বাংলোটায় একটু অপেক্ষা করতে পারবে? আমার কিছু জিনিসপত্তর রেখে গেলাম–

আমি চাইছিলাম বাংলোটার ওপর কেউ একটু নজর রাখুক। কিন্তু ডেডবডিটার কথা ওকে বলতে পারি না। ওকে ঠিক বোঝানোই মুশকিল। লোকটি বিনা বাক্যব্যয়ে টাকাটা হাতে নিয়ে উলটেপালটে দেখল, নোটখানা জাল কি না। আমি তাকে বললাম, এখানে একটু থেকো কিন্তু—আমি আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসছি। লোকটি তারও কোনো উত্তর দিল না।

আমি গাড়ি ছাড়ার একটু পরেই পেছনে তাকিয়ে দেখি লোকটা মাঠের ওপর দিয়ে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে। ওর বেশ মওকায় পাঁচটা টাকা লাভ হয়ে গেল।

মাধবী খিলখিল করে হেসে উঠল।

কর্নেল সেন বললেন, হাসছ? খুব বোকার মতন কাজ করে ফেলেছিলাম, তাই না? কিন্তু আগের রাত্তিরে ওইরকম একটা অভিজ্ঞতা হওয়ার পর তার পরদিন সব ব্যাপারে মাথা ঠিক রাখা শক্ত।

থানা অবশ্য খুব বেশি দূরে নয়, মাইল পাঁচেকের মধ্যেই, আমার গাড়ি সেখানে থামতেই গেটের সেপাই আমাকে দেখে লম্বা একটা স্যালুট দিল। বুঝলাম, আমার মিলিটারি পোশাকের মহিমা। ভেতরে ঢুকে দেখলাম, একজন সাব ইনস্পেকটর টেবিলের ওপর পা-তুলে দিয়ে এক মনে শ্যামাসংগীত গাইছে। আমাকে দেখেই তটস্থ হয়ে উঠল। আমি কিছু বলতে যাওয়ার আগেই বলে উঠল, বসুন স্যার, আমাদের বড়োবাবুকে ডাকছি।

বড়োবাবু এলেন লুঙি পরে। বিশাল বপু। অতসকালেই পান চিবোচ্ছেন। মফসসলে ছোটো থানায় এ-রকমই ঢিলেঢালা ব্যাপার চলে। অন্তত তখনকার দিনে চলত। বড়োবাবু অর্থাৎ ও. সি. আমাকে আপ্যায়ন করে বসালেন। বিগলিতভাবে বললেন, বসুন স্যার, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? চা খাবেন তো! ওরে, চা নিয়ে আয়! শিঙাড়া খাবেন? এই সময় গরম গরম শিঙাড়া ভাজে!

আমি বললাম, চা খাওয়ার সময় নেই। আমি একটা খুনের ঘটনার রিপোর্ট করতে এসেছি।

বড়োবাবু চোখ বড়ো বড়ো করে বললেন, খুন? আমার এরিয়ায়? একী অসম্ভব কথা!

বড়োবাবু চেঁচামেচি করে থানায় সব্বাইকে ডেকে জড়ো করলেন। তাদের সামনে আমাকে পুরো ঘটনাটা বলতে হল।

মোটমাট থানা থেকে ফিরে আসতে আমার মিনিট পঞ্চাশেক সময় লেগেছিল। বড়োজোর এক ঘণ্টা। দারোগাকে ঘটনার গুরুত্ব কিছুতেই বোঝানো যায় না। বার বার বলতে লাগলেন, তাঁর এরিয়াতে চাষাভুসোরা মাঝে মাঝে খুনোখুনি করে বটে, কিন্তু গত দু-তিন বছরের মধ্যে কোনো ভদ্রলোক খুন হয়নি। আমি শেষকালে একটু রাগের সঙ্গেই বললাম, আগে ডেডবডিটা দেখবেন চলুন—তারপর বিচার করবেন সেটা ভদ্রলোকের কিংবা চাষাভুসোর। আমার কাছে-একটা খুন হয়েছে, সেইটাই বড়োকথা, সেটা ভদ্রলোক কিংবা চাষার তাতে কিছু যায় আসে না।

এর পরেও দারোগা আমাকে চা না খাইয়ে ছাড়বেন না। আমার চা তেষ্টা পেয়েছিল বটে, কিন্তু দেরি করতে ইচ্ছে করছিল না। দারোগাবাবু বললেন, আরে মশাই ডেডবডি তো আর পাখা মেলে উড়ে পালাবে না! চা-টা নষ্ট করবেন কেন?

তারপর দারোগাবাবু গেলেন পোশাক বদলাতে। তাতে লাগল মিনিট দশেক। ফিরে এসে জিব কেটে বললেন, কিন্তু যাব কীসে? আমাদের গাড়িটা তো খারাপ হয়ে পড়ে আছে কাল থেকে! আমি বললাম, চলুন। আমার গাড়িতে চলুন!

ফিরে এসে প্রথমেই আমি একটা পরিবর্তন লক্ষ করলুম। দরজায় আমার তালাটা লাগানো নেই। আমার তালার কোনো চিহ্নই নেই, দরজায় ডাকবাংলোর নিজস্ব ডবল তালা লাগানো। তার চাবি আমার নেই। অর্থাৎ এরমধ্যেই কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে।

আমি দারোগাকে বললাম, তালা ভাঙতে হবে। এই তালার চাবি তো এখন পাওয়া যাবে না।

দারোগাবাবু জানলার খড়খড়ি তুলে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করলেন। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার বলে এখন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তিনি আমাকে বললেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান, অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? তালা ভাঙা কি অতসহজ?

দারোগা হাঁক দিলেন, চৌকিদার, এ চৌকিদার!

আশ্চর্যের ব্যাপার, চৌকিদার রামদাস তার ঘর থেকে গুটি গুটি বেরিয়ে এল। আমাকে সে একেবারে গ্রাহ্যই করল না। দারোগার সামনে লম্বা এক সেলাম দিয়ে বলল, জি হুজুর।

আমি তাকে ধমক দিয়ে বললাম, সকাল বেলা কোথায় চলে গিয়েছিলে?

কোনো উত্তর না দিয়ে সে হাবার মতন তাকিয়ে রইল। লোকটি অতিধূর্ত, সুবিধেজনকভাবে সেসব কথা কানে শুনতে পায় না। দারোগার ডাক শুনতে পেল, আমি চেঁচিয়ে মরলেও শুনতে পায়নি। এখনও আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না।

আবার তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কাল রাত্তিরে কিছু শুনতে পাওনি? অতবার ডাকলাম তোমাকে

চৌকিদার তাও কোনো উত্তর দেয় না।

দারোগা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই বাবুকে চিনতে পারছ না?

চৌকিদার মাথা নেড়ে বলল, না।

কোনোদিন দেখনি?

আজ্ঞে না।

আমি স্তম্ভিত। লোকটা বলে কী! রাগে শরীর জ্বলছিল। কিন্তু এখন বেশি রাগ না দেখানোই ভালো। যথাসম্ভব শান্তভাবে বললাম, কাল রাত্তিরে আমি এখানে ছিলাম, আর তুমি বলছ আমাকে কখনো দেখনি?

আজ্ঞে না হুজুর!

ঠিক আছে। তুমি খুব শয়তান, না? বুঝবে পরে মজা। খাতা নিয়ে এসো। বাংলোর খাতা কোথায়? সেখানে আমি নাম লিখেছি।

দারোগা বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে। সেসব পরে হবে। এখন দরজা খুলে দাও।

চৌকিদারটার কী স্পর্ধা। সে নিরীহভাবে জিজ্ঞেস করল, আপনি থাকবেন হুজুর?

দারোগা বললেন, থাকব কি না সে আমি পরে বুঝব। এখন দরজা খোললা তো!

দরজা খোলা হল। মৃতদেহটা সেখানে নেই।

মাধবী চমকে উঠে বলল, নেই? ওর মধ্যেই সরিয়ে ফেলেছে? ইস মামাবাবু, আপনি কেন ডাকবাংলো ছেড়ে চলে গেলেন?

রঞ্জন ধমকে উঠে বলল, বাজে বোকো না! চুপ করে শোনো—ডাকবাংলো ছেড়ে না গেলে পুলিশে খবর দিতেন কী করে?

মামাবাবু বললেন, শুধু যে মৃতদেহটা নেই তাই-ই নয়। কোনো কিছুই নেই। আমার সুটকেস, জামাকাপড় সব উধাও। আমি যে ওই ডাকবাংলোয় একরাত কাটিয়েছি—তার সব চিহ্নও লোপাট করে দিয়েছে। এমনকী, বাথরুমে আমি আমার সাবান টুথব্রাশ রেখে গিয়েছিলাম, সে দিকেও ওরা নজর দিতে ভোলেনি। চেয়ার টেবিল খাট সব ঠিক জায়গায় বসানো। ওরা খুব নিপুণ হাতে কাজ সেরেছে।

দারোগা আমার দিকে তাকিয়ে ঈষৎ হেসে বললেন, কী মশাই, কী ব্যাপার?

আমি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়েছি ঠিকই। সেটাকে সামলে উঠে চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করলাম, কী হে রামদাস, মড়াটা কোথায় গেল?

আমি তো কিছু জানি না হুজুর!

কিছু জান না? এখানে একটা খুন হয়নি?

খুন? কী বলছেন হুজুর!

আমার জিনিসপত্তরগুলো কোথায় গেল? আমার সুটকেস?

উত্তর না দিয়ে আবার হাবার মতন তাকিয়ে রইল রামদাস। লোকটা দারুণ অভিনয় করতে পারে। এখন দেখলে মনে হয়, ভাজা মাছটিও উলটে খেতে জানে না।

যাও বাংলোর খাতা নিয়ে এসো।

চৌকিদার দৌড়ে গিয়ে খাতা নিয়ে এল। যা মনে মনে আশঙ্কা করছিলাম, তাই। খাতার একটা পাতা খুব সাবধানে ছিড়ে নেওয়া হয়েছে। সেটা অবশ্য প্রমাণ করা খুব শক্ত নয়, কিন্তু দারোগাকে বোঝাবার ব্যাপারে তাতে কোনো কাজ হবে বলে মনে হয় না।

তবু আমি দুর্বলভাবে বললাম, দেখুন এই খাতা দেখে মনে হয়, এখানে ছ-সাত মাসের মধ্যে কোনো ভিজিটার আসেনি। সেটা সম্ভব? লাস্ট এন্ট্রি রয়েছে মার্চ মাসের।

দারোগাটি গম্ভীরভাবে বললেন, হুঁ, সেটা তো বুঝলাম। কিন্তু খুনের অভিযোগ দায়ের করতে হলে একটা ডেডবডি অন্তত থাকা দরকার। সেটাই তো পাওয়া যাচ্ছে না। একটা ডেডবডি তো আর উধাও হয়ে যেতে পারে না?

এরা এরমধ্যে এসে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

এই দিনের আলোয়? ভেরি আনলাইকলি! ভেরি আনলাইকলি!

আপনি ওই চৌকিদারকে ভালো করে জেরা করুন। ও সব জানে। ওর কাছ থেকে সব বার করা যাবে। কাল রাত্রে এখানে একটা জিপগাড়ি এসেছিল। তাতে একটা মেয়ে এবং আরও কয়েকজন লোক ছিল—চৌকিদার সেসব কথা জানে—ওর ঘরে আলো জ্বলছিল তখন, আমার ডাকে সাড়া দেয়নি—

দারোগাবাবু আকস্মিকভাবে হেসে উঠে বললেন, আর যাই বলুন, আপনার ওই মেয়েটির কথা ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। রাতদুপুরে একটা মেয়ে ঘরে ঢুকে কাঁদবে আবার উধাও হয়ে যাবে—ও নিশ্চয়ই আপনি স্বপ্ন দেখেছিলেন। ওসব তো গল্পে হয়। পাঁচকড়ি দে-র কী যেন গল্প আছে-না, নীলবসনা সুন্দরী না কী যেন–

আমি দৃঢ়ভাবে বললাম, আমি যা বলছি, তার প্রত্যেকটা কথা সত্যি। এখানে একটা খুন হয়ে গেছে—ব্যাপারটা আপনি হালকাভাবে নেবেন না!

কিন্তু একটা কিছু ভিত্তি তো থাকা দরকার। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে আপনি যাকে দেখেছিলেন, সে হয়তো সত্যি সত্যি মরেনি। কোনো কারণে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তারপর জ্ঞান ফিরে পেয়ে চলে গেছে।

আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমি একজন ডাক্তার। কে মারা গেছে আর কে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে—এটা একজন ডাক্তার প্রায় খালি চোখেই বলে দিতে পারি। যেমন আপনাকে দেখে আমি বলতে পারি, আপনার ডায়াবেটিস আছে।

দারোগাটি চমকে উঠে বললেন, অ্যাঁ? আপনি দেখেই বুঝতে পারেন? ধরেছেন তো ঠিকই। বছর খানেক হল ডায়াবেটিসে ভুগছি! ভাত, আলু, মিষ্টি—সব বন্ধ। জীবনটা বরবাদ হয়ে গেল। এখানে ডাক্তার-বদ্যিও তেমন ভালো নেই। বাইচান্স আপনার সঙ্গে যখন দেখা হয়েইছে—একটা ভালো ওষুধ বাতলে দেবেন কিন্তু। অন্তত দু-বেলা ভাত যাতে খেতে পারি-যাকগে তাহলে এখন কী করা যায় বলুন তো? আপনার একটা কিছু ভুল হয়েছে নিশ্চয়ই।

আমি দারোগাবাবুকে একটা চেয়ার দেখিয়ে বললাম, বসুন, দু-একটা কথা বলা যাক। আপনার লোকদের বলুন, চৌকিদারের ওপর যেন নজর রাখে। ওকে পালাতে দেওয়া ঠিক হবে না।

দারোগাবাবু চেয়ারে বসে আমার কাছ থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরালেন। তারপর আরাম করে সেটাতে টান দিয়ে বললেন, এখানে বেশিক্ষণ সময় নষ্ট করা যাবে না। কাল দুটো স্মাগলিং-এর কেস ধরা পড়েছে। সেখানে এনকোয়ারিতে যেতে হবে। বলুন স্যার কী বলবেন!

আমি বললাম, শুনুন, আপনাকে সকাল বেলা দশ মাইল দূরের থানা থেকে ডেকে এনে কিছুই দেখাতে পারলাম না—এতে মনে হতে পারে যে, আমি আপনার সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল জোক করছি। কিন্তু আপনার সঙ্গে সেরকম কোনো মধুর সম্পর্ক আমার নয়। তা ছাড়া ঠাট্টা রসিকতা করে এতটা সময় নষ্ট করার মতন সময়ও আমার হাতে নেই। আর এক হতে পারে, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি সব কিছুই ভুল দেখছি, ভুল শুনছি! কিন্তু আপাতত নিজেকে আমার পাগল বলেও মনে হচ্ছে না। আমি জরুরি কাজে পুরুলিয়া যাচ্ছিলাম। সেসব আমার মাথায় উঠে গেছে। এখন এই ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ছি না। আপনি থানায় অতক্ষণ দেরি না করলে বোধ হয় আমরা আসামিদের হাতেনাতে ধরতে পারতাম। আপনি যদি ব্যাপারটায় গুরুত্ব দিতে না চান, তাহলে আমি এখানকার ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টারসে যাব।

দারোগা মন দিয়ে আমার কথা শুনলেন। তারপর বললেন, আমার এখন তা হলে কী করা উচিত বলুন তো? আপনার সব কথা যদি সত্যিও হয়, তা হলেও তো মনে হচ্ছে এটা ভৌতিক কারবার। ভূতের সঙ্গে পুলিশ কী করবে? আমি মশাই বামুনের ছেলে, আমি ভূতপ্রেত, ঠাকুরদেবতা সব মানি।

সে আপনি যাই মানুন, এক্ষুনি গোটা বাংলোটা, চৌকিদারের ঘর সার্চ করে দেখুন। এই চৌকিদারকেও কি আপনার ভূত বলে মনে হয়? সে কাল রাত্রে জেগে ছিল, কিন্তু আমার ডাক শুনেও আসেনি। আজ সকালে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।—এখন আবার জলজ্যান্ত হয়ে ফিরে এসে বলছে, কিছুই জানে না। চৌকিদারকে ভালোভাবে জেরা করুন।

তা হলে কি আপনি বলছেন, চৌকিদারই যত নষ্টের গোড়া। ও ব্যাটাই খুন করেছে?

না, সে-কথা আমি বলতে চাইছি না। তবে ও নিশ্চয়ই ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িত। ও অনেক কিছু জানে।

দারোগা আড়মোড়া ভেঙে উঠলেন। সঙ্গের লোকদের সার্চ করার হুকুম দিলেন। এবং নিজের কৃতিত্ব দেখাবার জন্য হঠাৎ ঠাস করে এক চড় মারলেন চৌকিদারের গালে। হুংকার দিয়ে বললেন, বল, হারামজাদা! কাল রাত্তিরে কী হয়েছিল, বল।

ডাকবাংলোটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। চৌকিদারের ঘরেও কিছু নেই। ওরা কাজ করেছে নিখুঁতভাবে। পুলিশের চোখে আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টাও করেছে বেশ ভালোভাবে।

এইসব কিছুর মধ্যেই আমি সেই মেয়েটির অনেকখানি ভূমিকা দেখতে পাচ্ছিলাম। এত তাড়াতাড়ি ঘরদোর পরিষ্কারভাবে গুছিয়ে যাওয়া কোনো পুরুষের কাজ নয়, তা হলে দু একটা ভুল থেকেই যেত। মেয়েরা সাধারণত ভুল করে না। মেয়েটি কি তাহলে সর্বক্ষণ কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে থেকে আমার গতিবিধি লক্ষ করছিল?

চৌকিদারের ঘরের জানলার পাশে একটা ছোট্ট হলদে রুমাল পাওয়া গেল। মেয়েলি রুমাল, লেসের কাজ করা–কিন্তু কোনো নাম-টাম লেখা নেই। দারোগাবাবু ওটাকে পাত্তা দিলেন না। রুমাল-টুমাল থেকে সূত্র খুঁজে বার করা শুধু বইতেই দেখা যায়। বাংলার কম্পাউণ্ডে জিপগাড়ির চাকার দাগ–অন্তত আমার গাড়ি ছাড়া, অন্য গাড়ির চাকার যে-দাগ আছে, সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। দারোগাবাবুর কাছে ওরও কোনো মূল্য নেই।

কিন্তু অপরাধীদের কাজ যতই নিখুঁত হোক, একটা-না একটা ভুল তারা করবেই। এক্ষেত্রেও তারা একটা মারাত্মক ভুল করে গেছে। এ-রকম ছেলেমানুষি ভুলের কথা কল্পনাই করা যায় না।

দারোগাবাবু বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। আমাকে শেষপর্যন্ত পাগলই ভেবে বসেছিলেন হয়তো। তিনি তখন ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু ফিরতে হলে আমার গাড়িতেই ফিরতে হবে। আসবার সময়ই সেটা কড়ার করে নিয়েছেন। আমার তখন যাওয়ার একটুও ইচ্ছে নেই। হার স্বীকার করে চলে যাব? দারোগাবাবু তাঁর লোকজনকে চতুর্দিকে খোঁজাখুঁজি করার জন্য খুব হম্বিতম্বি করছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মুখে সব সময় একটা মৃদু মৃদু হাসি। ওই হাসিটাই আমার অসহ্য লাগছিল।

অক্লান্তভাবে আমি নিজেই চতুর্দিকে খুঁজে দেখছিলাম। ডাকবাংলোর কম্পাউণ্ড ছেড়ে উঠে গেলাম সেই বাঁধটার ওপর। নীচেই খাল। সেই খালের জলে একটা কী যেন কালো মতন জিনিস ভাসছে। দু-তিনটে বাচ্চাছেলে জলের মধ্যে নেমে লাঠি দিয়ে ধরার চেষ্টা করছে সেই জিনিসটা।

আমি তরতর করে নীচে নেমে গেলাম। তারপরই চেঁচিয়ে ডাকলাম দারোগাবাবুকে।

খালের জলে ভাসছে আমার সুটকেসটা। অপরাধীরা আমার সব জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলেছিল—ডাকবাংলোতে আমার থাকার প্রমাণ লোপ করবার জন্য। কিন্তু আমার জিনিসপত্রগুলো ওদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই তো সবচেয়ে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু কোনো একটা দুর্বলতায় ওরা সঙ্গে নিয়ে যায়নি, ছুড়ে ফেলে দিয়ে গেছে খালের জলে। খালের জল বেশি নয়, স্রোতও নেই, সুটকেসটা ভেসে যায়নি। গ্রামের ছেলেরা ওই জিনিসটা দেখতে পেয়ে তোলার চেষ্টা করছে মহা উৎসাহে।

মোটা শরীর নিয়ে দারোগাবাবুর নেমে আসতে সময় লাগল। নেমে হাঁসফাঁস করতে লাগলেন। বললেন, কী ব্যাপার? এটা কী?

আমার সুটকেস! এবার প্রমাণ হল তো, এই বাংলোতে কাল রাত্রে আমি ছিলাম। চৌকিদার আগাগোড়া মিথ্যেকথা বলছে!

দারোগা এর উত্তরে কী বললেন জান? বললেন, তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু এতেও কিন্তু খুনের ব্যাপারটার কিছুই প্রমাণ হয় না।

শুনেই আমার রাগ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে ছিলাম। এবার আমি প্রায় ধমকেই বললাম, আপনার ব্যাপারটা কী বলুন তো? খুন-টুন কিছু হয়নি এটাই আপনি প্রমাণ করার জন্য ব্যস্ত! নাকি খুন যে-করেছে, সেই আসামিকে ধরতে চান?

এরা সব শক্তের ভক্ত। ধমক খেয়েই দারোগাটির সুর বদলে গেল। তটস্থ হয়ে বললেন, সে কী বলছেন? খুন হলে খুনিকে ধরব না? একটা মার্ডার কেস ধরতে পারলে আমার প্রমোশন হয়ে যাবে। কতদিন ধরে বদলির চেষ্টা করছি এখান থেকে। খুন হওয়া মানে তো আমার গুড লাক! তবে আমাদের এখানে তো এ-রকম কেস-টেস বিশেষ হয় না

সুটকেসটা তোলা গেল সহজেই। চৌকিদারকে ডাকা হল। দারোগাবাবু তাকে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কিরে, তুই যে কিছু জানিস না বললি? এই সাহেবের সুটকেস এখানে এল কী করে?

চৌকিদারের সেই এক উত্তর, আমি কিছু জানি না হুজুর।

জানিস না মানে? তুই বাংলোর চৌকিদার হয়েছিস—আর বাংলো থেকে জিনিসপত্তর উধাও হয়ে খালের জলে ভাসবে?

আমি সকাল বেলা তেল আনতে গিয়েছিলাম। তখন কেউ চুরি করেছে।

তাহলে তখন যে বললি, এই সাহেবকে তুই কখনো দেখিসনি? অ্যাঁ? কী ব্যাপারটা কী? সাহেব তাহলে রাত্তিরে এখানেই ছিলেন?

চৌকিদার আবার চুপ! দারোগা তখন চৌকিদারকে এমন মারতে শুরু করলেন যে, আমাকেই থামাতে হল। আমি বললাম, ওকে এত মেরে কী হবে? মারলে ও কী বলবে?

দারোগা হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, আপনি জানেন না! এরা মার ছাড়া কিছু বোঝে না। এই জমাদার, বাঁধো একে। থানায় চলুক, সেখানে গিয়ে বুঝবে।

খালের ওপাশে তখন রীতিমতো ভিড় জমে গেছে। যে বাচ্চা ছেলেগুলো সুটকেসটা তোলার চেষ্টা করছিল, তাদের একজনকে ডেকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই খোকা, শোননা। সকাল বেলা এখানে একটা জিপ গাড়ি দেখেছ?

ছেলেটি বললে হ্যাঁ। রায়বাবুর জিপ।

রায়বাবু মানে, কোন রায়বাবু?

ছেলেটি আবার বলল, রায়বাবুর জিপগাড়ি।

আমি দারোগাকে বললাম, এই ছেলেটির নাম-টাম জেনে নিন। পরে এর কথা কাজে লাগবে। রায়বাবুর জিপ যে বলছে, রায়বাবু কে? মনে হচ্ছে এখানে প্রায়ই আসে! ওরা চেনে।

দারোগা বললেন, খোঁজ নিতে হবে। খোঁজ নিলেই বেরিয়ে পড়বে।

পরে যখন আদালতে মামলা ওঠে, তখন ওই ছেলেটির সাক্ষী খুব কাজে লেগেছিল। ওই ছেলেটি দেখেছিল, চলন্ত জিপগাড়ি থেকে সুটকেসটা ফেলে দেওয়া হয়েছিল খালের মধ্যে। এবং সেই জিপগাড়ির মধ্যে যারা ছিল, তাদেরও সে শনাক্ত করেছে।

শুধু তাই নয়, ওইখানে আর একটাও খুব জরুরি খবর পাওয়া গেল। ভিড় ঠেলেঠুলে এগিয়ে এল সেই বুড়ো। যাকে আমি পাঁচ টাকা দিয়েছিলাম। তোমরা তখন ওকে পাঁচটা টাকা দেবার কথা শুনে হেসেছিলে। ও কিন্তু ওর কাজ ঠিকই করেছে। গ্রামের সরল সাধারণ লোক টাকা নিলে তার বিনিময়ে কাজটা ঠিকই করে! এটা আমার অনেক দিনের অভিজ্ঞতা। লোকটাকে সেই পাঁচ টাকা দিয়েছিলাম বলে খুনের কিনারা করতে সাহায্য হয়েছিল অনেকখানি। দূরে কোনো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বাংলোর দিকে লক্ষ রেখেছিল।

সেই বুড়ো লোকটি বলল, সকাল বেলা সে রায়বাবুর জিপ আসতে দেখেছে এখানে। খানিকটা বাদে আবার চলে গেছে। রায়বাবুকেও সে চেনে। রায়বাবু হচ্ছেন পি ডব্লুডি-র ওভারসিয়ার বাবু।

আমি দারোগার চোখের দিকে তাকালাম। তাঁর চোখ-মুখ এখন চিন্তাসংকুল। তিনি বললেন, কিছুই বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা। পি ডব্লুডি অফিসে সুখেন রায় নামে একজন ওভারসিয়ার ভদ্রলোক আছেন বটে। তাঁর একটা জিপগাড়িও আছে। কিন্তু তাঁর জিপে এইসব...

আমি বললাম, চলুন, আর দেরি না করে সেই সুখেন রায়ের কাছে যাওয়া যাক। তার কাছেই সব কিছু জানা যাবে।

একজন কনস্টেবলকে সেখানে পাহারায় রেখে আমরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। যাওয়ার আগে আমি দারোগাবাবুকে বললাম, আপনি আপনার কনস্টেবলকে বলুন যেন চৌকিদার রামদাসকে সে কোনোক্রমেই চোখের আড়াল না করে! কারণ লোকটা বোকা সেজে থাকলেও আসলে অতিধূর্ত। একটু সুযোগ পেলেই আরও হয়তো প্রমাণ লোপ করবার চেষ্টা করবে। মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই সে ডাকবাংলোর ঘরখানা এমন পরিষ্কার করে ফেলেছিল যে আমিই প্যাঁচে পড়ে গিয়েছিলাম। আমি যে একটা গালগল্প বানিয়ে বলছি না, সেটা দারোগাবাবুকে বিশ্বাস করানোই শক্ত হয়ে উঠেছিল।

গাড়িতে দারোগাবাবুকে বেশ গম্ভীর আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখা গেল। এমনিতে তিনি বেশি কথা বলতে ভালোবাসেন, কিন্তু গাড়িতে একটাও কথা বললেন না। আমার মনে হল, দারোগাবাবুর চেনাশুনো স্থানীয় লোকেরাই এর সঙ্গে জড়িত, তিনি এ-রকম সন্দেহ করছেন। সেটা অমূলকও নয়। মৃতদেহটা ফেলে যাওয়া এবং আবার ফিরে এসে সেটা সরাবার জন্য ব্যস্ততাতেই সেটা বোঝা যায়। দূর অঞ্চলের লোক হলে হয় আততায়ীরা মৃতদেহটা ফেলেই পালাতো অথবা সঙ্গে করে নিয়ে যেত। কাছাকাছি জায়গার লোক বলেই তারা ঘরদোর পরিষ্কার করে মৃতদেহটা লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল খাটের নীচে।

অন্যদিকে সব ব্যবস্থা সেরে এসে আবার রাত্রির অন্ধকারে সরিয়ে ফেলবে—এই ছিল প্ল্যান। দূরের লোক হলে তাদের পক্ষে একটা সুবিধে ছিল। তারা সব চিহ্ন বিলোপ করে মৃতদেহটা ফেলে রেখে যদি সরে পড়তে পারত—তাহলে মৃতব্যক্তিটির পরিচয় খুঁজে বার করতে করতেই সময় লেগে যেত বেশ কয়েকদিন। ততদিনে আততায়ীরা পগারপার হওয়ার পক্ষে পেয়ে যেত অনেক সুযোগ। কিন্তু স্থানীয় লোক হলে মৃতদেহটি দেখেই সবাই চিনে ফেলবে! তখনই তার সঙ্গে জড়িত অন্য লোকদের ওপর পড়বে পুলিশের দৃষ্টি।

কর্নেল সেন হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কি, আমার অ্যানালিসিস ঠিক হচ্ছে? রঞ্জন বলল, পারফেক্ট। এরকুল পোয়ারোও ঠিক এইকথাই বলতেন। কর্নেল সেন বললেন, সেইসময়ে আমিও প্রায় ডিটেকটিভ হয়ে উঠেছিলুম। না হয়ে উপায়ও ছিল না। কারণ, আমাদের দারোগাবাবুটি আগাগোড়া একটুও বুদ্ধির পরিচয় দেননি। অথচ রহস্যটার একটা কিনারা না-হওয়া পর্যন্ত আমি কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। গ্রাম ট্রামের দিকে আমাদের থানা পুলিশের যা অবস্থা—তাতে সেখানকার মানুষ যে পটাপট খুন করে না কেন, আমি বুঝতে পারি না। একটু বুদ্ধি খাটিয়ে কেউ খুন করলে, তাকে ধরার সাধ্য পুলিশের নেই। তবে, সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের গ্রামদেশের মানুষেরা সাধারণত শান্ত প্রকৃতির—কথায় কথায় খুনজখম করে না। কখনো রাগের মাথায় হয়তো কারুকে মেরে বসে —সেটা এমনই প্রকাশ্যভাবে হয় যে ধরা পড়তেও দেরি হয় না। জটিল, কুচক্রী ধরনের খুন শহরেই বেশি হয়।

যাইহোক, আমার এ-গল্প শেষ হয়ে এসেছে। এটাও এমন জটিল খুনের কাহিনি নয়। মাঝখান থেকে আমি জড়িয়ে পড়েছিলাম বলে একটু জট পাকিয়ে গিয়েছিল। অভিজ্ঞতাটা আমার পক্ষে হয়েছিল সাংঘাতিক। নইলে, তোমাদের বইতে যেসব খুনের গল্প থাকে, তারমধ্যে কখনো বুদ্ধিমান খুনিরা সুটকেসটা ফেলে যাওয়ার মতো কাঁচা কাজ করে? কিংবা ডিটেকটিভের জন্য এতটা সুবিধে করে দিয়ে যায়? কিন্তু জীবনে বাস্তব ঘটনায় এ-রকম ভুল অনেকবার হয়।

সুটকেসটা ফেলে না গেলে খালের পাশের গ্রামের লোকদের জেরা করার কথা আমাদের মনে আসত না হয়তো। আর তারা নিজে থেকে এগিয়ে এসে যে কিছু বলত না–তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু গ্রামের লোককে জেরা করে ওই জিপগাড়িতে ক-জন লোক ছিল এবং তাদের চেহারার বর্ণনাও আমরা পেয়ে গেলাম।

মাধবী জিজ্ঞেস করল, ডাকাতরা সবাই ধরা পড়েছিল শেষ পর্যন্ত? রঞ্জন বলল, তুমি কী করে জানলে এটা ডাকাতদের ব্যাপার? যারা রাত্তির বেলা জিপে করে বন্দুক নিয়ে এসে আক্রমণ করে, তারা ডাকাত ছাড়া কী? আর সেই ডাকাতদলের লিডার হচ্ছে একটা মেয়ে? মেয়ে ডাকাত? এ যে হিন্দি সিনেমা! কর্নেল সেন হাসতে হাসতে বললেন, কিন্তু ডাকাতরা কীসের জন্য ওই বাংলোতে আসবে। কারোর কাছে তো বেশি টাকাপয়সা নেই!

যে-লোকটা খুন হয়েছে, সে হয়তো কোনো ব্যবসায়ী! সঙ্গে অনেক টাকা ছিল।

রঞ্জন বলল, মামাবাবু, আপনি মাধবীর কথা শুনবেন না। যেরকম বলছিলেন সেইরকম বলে যান।

পি ডব্লুডি অফিসে পৌঁছে সুখেন রায়কে পাওয়া গেল না! দারোগার সঙ্গে ওই অফিসের অনেকেরই চেনা। দারোগাবাবু যে ওখানে খুনের তদন্ত করতে এসেছেন, সে-কথা কেউ বুঝতে পারেনি। তিনিও বুঝতে দেননি। অফিসের লোকেরা দারোগাবাবুকে খাতির করে বসালেন, এমনকী চায়ের অর্ডারও হয়ে গেল। বোঝা গেল দারোগাবাবুটি মাঝে মাঝে ওখানে এমনই আসেন।

কথায় কথায় দারোগাবাবু বললেন, সুখেনকে দেখছি না কেন? সুখেন কোথায়?

অফিসের একজন বলল, সুখেন পাটনায় হেড অফিসে কী একটা ব্যাপারে তদ্বিরে গেছে। ফিরতে কয়েকদিন দেরি হবে!

দারোগাবাবু উদাসীনভাবে বললেন, তাহলে কী হবে? সুখেনের সঙ্গে এই ভদ্রলোকের একটু দরকার ছিল। সেইজন্যই এসেছিলাম। কাজটা তাহলে হল না! একটা জরুরি বাড়ির প্ল্যান করানো দরকার এনার। সুখেনের কিছু টাকা রোজগার হয়ে যেত। ওহে রণধীর, সুখেন কবে নাগাদ ফিরবে তাও বলতে পার না?

রণধীর নামের কর্মচারীটি বলল, দিন দশেক তো লাগবেই। কীসে গেছে? ট্রেনে? না, ও জিপগাড়িটা নিয়ে গেছে। দারোগাবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, চলুন ওঠা যাক তাহলে। কাজ তো হল না।

সেই অফিস থেকে বেরিয়ে এসে দারোগাবাবু বললেন, এবার? এখানেও তো কিছু পাওয়া গেল না।

আমি বললাম, সুখেন রায় কোনো ছুটির দরখাস্ত করে গেছে কি না সেটা আপনার দেখা উচিত ছিল। যদি সে টুরেও গিয়ে থাকে, তাহলে অফিসে তার টুর প্রোগ্রামের একটা রেকর্ড থাকবে—সেগুলো আপনি চেক করে দেখলেন না? একটা লোক তো এমনি এমনি অফিস ছেড়ে আউট স্টেশনে যেতে পারে না?

দারোগার কী করা উচিত, না উচিত সে-সম্পর্কে আমার উপদেশ দেওয়া তিনি এখন আর একটুও পছন্দ করলেন না। ভুরু কুঁচকে তাকালেন আমার দিকে। কিন্তু আমার কথা উপেক্ষা করতেও সাহস পেলেন না। হাজার হোক আমি মিলিটারির লোক। মিলিটারির সম্পর্কে আমার দেশের লোকের বেশ ভয় ও শ্রদ্ধা আছে।

তিনি আমার কথাটা উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বললেন, এইসব মফসসলের ছোটোখাটো অফিসে কি আর সব নিয়মকানুন মানে? আপনাদের স্যার বড়ো বড়ো ব্যাপার

সব কিছু স্ট্রিক্ট। কিন্তু এসব জায়গায় এরা বিনা দরখাস্তে ছুটি নেয়—নিজস্ব দরকারে কোথাও গেলেও সেটা টুর হিসেবে দেখায়—নিজেদের মধ্যে সব কিছু ম্যানেজ করে নেয়।

আমি দৃঢ় গলায় বললাম, তবু আপনার চেক করে দেখা উচিত। আমাকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে দারোগাবাবু এবার একা গেলেন। একটু বাদে ফিরে এসে বললেন, না সেসব কিছু নেই। সুখেন ফিরে এসে দরখাস্ত করে দেবে বলে গেছে। এসব এখানে প্রায়ই হয় বলল।

কিন্তু সুখেন রায় যে-জিপগাড়ি নিয়ে পাটনা গেছে, সেই জিপগাড়িই আজ সকাল বেলা বাংলোর সামনে দেখা গেল কী করে?

বোঝাই তো যাচ্ছে, ওই চাষাভুসোরা ভুল দেখেছে। সুখেনের জিপগাড়ি ওখানে মাঝে মাঝে যায় তো—সুখেনের সুপারভিশনেই তো বাংলোটা তৈরি হল। গাঁয়ের লোক তো বেশি গাড়ি-টাড়ি দেখে না—তাই যেকোনো জিপগাড়ি দেখলেই ভাবে সুখেনের গাড়ি।

গ্রামের দু-একজন লোক কিন্তু সুখেনকেও ওই গাড়িতে বসে থাকতে দেখেছে। জিপের পেছনের দিকে হেলান দিয়ে বসেছিল।

ওই খুনে গুণ্ডাদের দলে সুখেনও থাকবে আপনি ভাবছেন? আমি সুখেনকে চিনি—সে একটা পিঁপড়েও মারতে চায় না।

আমি কোটের পকেট থেকে আমার ডায়েরি বার করে ব্যাপারটা নোট করলাম। তারপর দারোগাবাবুকে বললাম, এবার তাহলে আমাকে পুরো ঘটনাটি আপনাদের ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টারসে গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে। আমি নিজের চোখে একটা ক্রাইম ঘটতে দেখেছি। ল অ্যাবাইডিং সিটিজেন হিসেবে সেটা কতৃপক্ষকে জানানো আমার কর্তব্য। সুতরাং ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টারসে একবার যেতেই হবে আমাকে।

দারোগাবাবু বললেন, তা তো নিশ্চয়ই। অবশ্য আমরাও ওপর মহলে রিপোর্ট পাঠাব। আপনি তো আমাদের জানিয়েছেনই। আমরাও প্রিলিমিনারি ইনভেসটিগেশনের পর ওপর মহলের হাতে কেসটা দিয়ে দেব। তবে মুশকিল হচ্ছে এই, ডেডবডিটারই কোনো ট্রেস পাওয়া গেল না।

আমি বললাম, ঠিক আছে, আপনারা জানাবেন সে তো ভালো কথাই। আমিও আমার তরফ থেকে জানিয়ে দিয়ে বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকতে চাই। চলুন তাহলে আপনাকে থানায় নামিয়ে দিয়ে ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টারসে যাই।

দারোগাবাবু চিন্তিতভাবে বললেন, যাবেন? চলুন! বুঝতেই পারছি, আপনার সন্দেহ কিছুতেই মিটছে না। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখুন, আমরা যে তদন্ত শুরু করব—তার একটা ভিত্তি কী আছে, আপনার মুখের কথা ছাড়া? বাংলোর চৌকিদারটা অবশ্য একটা কিছু অপকর্ম করেছে ঠিকই—নইলে আপনার সুটকেস খালের জলে পাওয়া যাবে কেন? আপনি তো আর নিজে সেটা ফেলেননি! গ্রামের লোক কি জিপগাড়ি-টাড়ি দেখেছে—সে-কথা ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। চৌকিদারের ওই বদমাইশির সঙ্গে তো আর খুনের ব্যাপারটা এক করা যায় না! আচ্ছা এক কাজ করা যাক। যাওয়ার আগে একবার সুখেনের বাড়িটি ঘুরে যাওয়া যাক চলুন। আপনার আপত্তি নেই তো?

ছোট্ট ঘিঞ্জি শহরটির নাম আমি তোমাদের কাছে ইচ্ছে করেই বলছি না। তবে বিহার বা পশ্চিমবাংলার ছোটোখাটো শহর তোমরা দেখেছ নিশ্চয়ই। একইরকম হয়। সুতরাং অনুমান করে নিতে তোমাদের অসুবিধে হবে না।

যেতে যেতে দারোগাবাবু বললেন, সুখেন রায় এখানে বছর দুয়েক হল বদলি হয়ে এসেছে। অত্যন্ত নিরীহ, ভদ্র ছেলে। কোনো সাতে-পাঁচে নেই। লোকজনের উপকার করতে পারলে সুখী হয়। অফিসের কাছেই তার কোয়ার্টার পাওয়ার কথা, কিন্তু কোয়ার্টার খালি নেই বলে বাড়ি ভাড়া করে আছে। এখানে সেরকম কোনো ভালো বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না। যে-বাংলোটায় আপনি উঠেছিলেন, সেটা প্র্যাকটিক্যালি সুখেনেরই তৈরি। সুখেনই দেখাশোনা করে বানিয়েছে। চলুন, সুখেন যদি পাটনায় না গিয়ে বাড়িতেই বসে থাকে—আপনি তার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হবেন। সত্যিই ভালো ছেলে।

শহর একটু ছাড়িয়ে সুখেন রায়ের বাড়ি। বাড়িটার চেহারা সত্যিই ভালো নয়। সিমেন্টের দেওয়াল কিন্তু খাপরার ছাদ। তাও বেশ জরাজীর্ণ অবস্থা। সামনে একটু বাগানের মতন। সেই বাগানের এক কোণে একটি জিপগাড়ি দাঁড় করানো।

জিপগাড়িটি আমার আর দারোগাবাবুর এক সঙ্গেই চোখে পড়ল। দারোগা আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললেন, সুখেন বাড়িতেই আছে মনে হচ্ছে। পাটনায় যায়নি। ওর এখানে এসে ভালোই হল—ওর কাছ থেকেই সব কিছু জানা যাবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই জিপগাড়িটি কি সুখেন রায়ের নিজের? না অফিসের?

দারোগাবাবু বললেন, অফিসেরই। তবে ও নিজেই সব সময় প্রায় ব্যবহার করে। অফিসের গাড়িটা কেনা হয়েছে, কিন্তু ড্রাইভারের পোস্ট এখনও স্যাংশান করা হয়নি। জানেন তো গভর্নমেন্টের ব্যাপার। সুখেন ছাড়া আর কেউ গাড়ি চালাতে জানে না। তাই গাড়িটি সর্বক্ষণ ওর কাছেই থাকে।

বাগানের গেট খুলে আমরা ভেতরে ঢুকলাম, দারোগাবাবু এগিয়ে গেলেন বাড়ির দরজার দিকে। আমি গেলাম জিপটি একটু পরীক্ষা করতে। কাল রাত্তিরে আমি এই জিপটিই যে দেখেছিলাম, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ডান দিকের মাডগার্ডটা একদম তোবড়ানো। এতক্ষণ আমার মনে ছিল না একথা—এখন দেখামাত্র মনে পড়ল যে কাল রাত্তিরেও আমি এটি লক্ষ করেছিলাম। গ্রামের লোকদের পক্ষেও জিপটি চেনা এইজন্যই সহজ।

দরজা খুলল একটি মেয়ে। আমার বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। জীবনে এ-রকমভাবে চমকে গেছি খুবই কম বার। আর যাই হোক, এখানে এই অবস্থায় মেয়েটিকে আমি দেখার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি।

তাকে দেখে আমি অতি কষ্টে সামলে নিলাম নিজেকে। এই সেই কাল রাত্রে দেখা মেয়েটি। আজও তার চুলগুলো খোলা। সদ্য স্নান করেছে মনে হয়। একটি কালো রঙের তাঁতের শাড়ি পরে আছে। ভেজা চুলে জ্বলজ্বল করছে টাটকা সিঁদুর।

মেয়েটিকে দিনের বেলা দেখে বুঝলাম, এ-মেয়ে সাধারণ নয়। কাল রাতে ওকে অলৌকিক মনে হয়েছিল। এখন সেরকম কিছু মনে হয় না বটে, কিন্তু ছোট্ট শহরের একজন ওভারসিয়ারের বউ হিসেবে তাকে একদম মানায় না। খুব একটা সুন্দরী বলা যায় না তাকে। কিন্তু তার আঁটসাঁট স্বাস্থ্য ও চোখে-মুখে এমন একটা কিছু আছে, যা পুরুষদের মাথায় আগুন জ্বালায়। এইসব মেয়ে অনেক ঘর ভাঙে।

মেয়েটি আমাকে একদম গ্রাহ্যই করল না। আমাকে সে চিনতে পেরেছে কিংবা জীবনে আগে কখনো দেখেছে, এ-রকম কোনো চিহ্নই নেই তার মুখে। আমার মুখের দিকে এক পলক তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। দারোগাবাবুর দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, কী খবর? আসুন, আসুন! অনেকদিন আসেননি এদিকে!

দারোগাবাবু বললেন, এসেছিলাম এদিকে, তাই ভাবলাম তোমাদের এদিকে একবার ঘুরে যাই।

আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি একজন ডাক্তার। এখানে এসেছেন একটি কাজে। আর এ হচ্ছে করবী, আমাদের সুখেন রায়ের মিসেস। করবী খুব ভালো চা বানায়। এপাশে কাজকর্মে এলেই একবার এদের বাড়িতে চায়ের লোভে আসি। কি করবী, এখন একটু চা হবে নাকি? নতুন লোককে সঙ্গে করে এনেছি।

করবী এবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ভেতরে আসুন।

মেয়েটি দরজার একপাশে সরে আমাদের জন্য জায়গা করে দিল। ভেতরে ঢোকার সময় আমি মেয়েটির গা থেকে খুব হালকা ডেটলের গন্ধ পেলাম। আশ্চর্য, এই ডেটলের গন্ধটা কাল রাত থেকে আমাকে পেয়ে বসেছে। এই গ্রামদেশে এত ডেটলের ব্যবহার হয়। মেয়েটি তো একটু আগেই স্নান করেছে, তারপর আবার ডেটল মেখেছে? মেয়েটির কপালে সিঁদুর অথচ কাল রাত্রে মৃতদেহটিকে বলেছিল ওর স্বামী!

বসবার ঘরে একটি চৌকি পাতা, দু-টি চেয়ার ও একটি টেবিল। অনেক রকমের বইপত্তর চারিদিকে ছড়ানো। মফসসলের এ-ধরনের চাকুরিজীবীদের বাড়িতে সাধারণত এত বই দেখা যায় না।

দারোগাবাবু আরাম করে বসলেন চৌকিতে। আমি বসলাম চেয়ারে। দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, সুখেন কোথায়?

করবী বলল, ও তো পরশু পাটনা চলে গেছে।

দারোগাবাবু সবিস্ময়ে বললেন, পাটনা গেছে? জিপ নিয়ে যায়নি? আর অফিস থেকে যে বলল সুখেন পাটনায় দশদিনের টুরে গেছে জিপ নিয়ে?

করবী বলল, না শেষপর্যন্ত নিল না। জিপেই যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যাওয়ার সময় বলল ওর শরীরটা ভালো লাগছে না—অতটা একা ড্রাইভ করতে পারবে না। তাই ট্রেনেই গেল।

দারোগাবাবু বললেন, ইদানীং ওর শরীরটা ভালো যাচ্ছে না দেখছি। প্রায়ই ভুগছে, এই বয়েসের ছেলে, এরমধ্যে হার্টের অসুখ যদি হয়।

করবী দৃঢ়স্বরে বলল, না, হার্টের কিছু হয়নি। অনেক সময় উইণ্ডের জন্য ওরকম ব্যথা হয়। আমি বলেছি, এবার পাটনায় ভালো ডাক্তার দেখিয়ে আসতে।

দারোগাবাবু আমার দিকে ফিরে বললেন, বুঝলেন মশাই, সুখেনের বয়েস বেশি-না—কিন্তু মাঝে মাঝে বুকে এমন ব্যথা হয় যে, দেখলে ভয় লাগে। ব্যথার চোটে অজ্ঞান হয়ে যায়। আমি বার বার বলেছি, ভালোমতন চিকিৎসা না করলে কোনোদিন রাস্তাঘাটে অজ্ঞান হয়ে পড়ে বেঘোরে মরবে।

তারপর করবীর দিকে ফিরে বললেন, সুখেন আজ বাড়ি থাকলে ইনি ওর বুকটা একটু দেখে দিতে পারতেন। ইনি খুব বড়ো ডাক্তার।

আমি চুপ করে রইলাম। করবীও কোনো কথা বলল না।

দারোগাবাবু চায়ের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন, আমি অবশ্য চায়ের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছি। সকাল বেলা বেশি চা খাওয়া অভ্যেস নেই আমার। করবীর তৈরি বিখ্যাত চা খেতেও আমি প্রলুব্ধ হইনি।

তা ছাড়া, আমার আর সাসপেন্স সহ্য হচ্ছিল না। সেখানে আমরা বসেছিলাম এমনভাবে যেন কিছুই হয়নি। চা খেতে খেতে বিশ্রম্ভালাপ। সবই আমরা অভিনয় করছিলাম!

দারোগাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, করবী, আজকের কাগজ এসেছে নাকি? কাল নাকি পাটনায় খুব মারামারি হয়েছে-রেডিয়োতে বলছিল

করবী বলল, না, কাগজ তো সেই বিকেল বেলা দেয়।

করবী, সুখেনের কাছ থেকে জিপগাড়িটা কেউ এরমধ্যে ধার নিয়েছিল নাকি?

করবী আশ্চর্য হয়ে বলল, গভর্নমেন্টের জিপগাড়ি-অন্য কেউ ধার নেবে কী করে?

কাল সন্ধ্যেবেলা গ্রামের দু-একজন এই জিপগাড়িটাকে নাকি ঘুরে বেড়াতে দেখেছে।

তা হতেই পারে না!

দারোগাবাবু আমার দিকে তাকিয়ে চোখের ইঙ্গিত করলেন। অর্থাৎ সবটাই আমার ভুল। করবী আগেই গরম জল বসিয়ে এসেছিল, এবার উঠে গিয়ে চা করে নিয়ে এল। আমি খাব না বলেছিলাম, তবু আমার জন্য এনেছে। হাসিমুখে অনুরোধ জানালো, খান-না এক কাপ, অপূর্ব অভিনয়।

সেই অভিনয় ভেঙে দিয়ে আমি করবীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আমাকে আগে কখনো দেখেছেন?

করবী অবাক হয়ে বলল, আপনাকে না তো!

আমি কিন্তু আপনাকে দেখেছি।

করবী সঙ্গেসঙ্গে মুখের ভাব বদলে ফেলে বলল, তা হতেও পারে। আপনাকেও আমার একটু একটু চেনা লাগছে। আপনি কি রাঁচিতে প্র্যাকটিস করেন? কিংবা ওখানে আমাকে দেখেছেন কখনো? আমরা রাঁচিতে থাকতাম—বিয়ের আগে।

আমি বললাম, না, রাঁচিতে আপনাকে দেখিনি। আপনাকে আমি দেখেছি কাল রাত্তিরে। এখানে যে একটি ডাকবাংলো আছে, সেখানে!

করবী বিমূঢ়ভাবে দারোগাবাবুর মুখের দিকে তাকাল। তারপর আমার দিকে। আস্তে আস্তে বলল, ডাকবাংলোয়? আমাকে? আপনার নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে।

না, আমার অতসহজে ভুল হয় না। কিন্তু আমি বাড়ি ছেড়ে ডাকবাংলোয় কেন যাব বলুন তো! আমি তো কাল বাড়ি থেকে একবারও বেরোইনি।

আমি কিন্তু আপনাকে কাল ডাকবাংলোতেই দেখেছি। আপনিও আমাকে দেখেছেন এবং আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। এখন কিছুই মনে পড়ছে না?

করবী এবার দৃঢ়গলায় বলল, নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে। আপনি কী বলতে চান কী? আমি ডাকবাংলোয় যাব কেন? আমার স্বামী বাইরে গেছেন

একজন মহিলার স্বামী বাইরে টুরে গেছেন, আর মহিলাকে যদি রাত্তির বেলা একটি ডাকবাংলোতে দেখা যায়—সেটা নিশ্চয়ই একটি কলঙ্কের অপবাদ। একজনের বাড়িতে বসে এ-রকম অভিযোগ করার মধ্যে চূড়ান্ত অভদ্রতা আছে। কিন্তু এটা তো ভদ্রতা-অভদ্রতার প্রশ্ন নয়। এরমধ্যে একটা খুনের ব্যাপার জড়িত।

কাল রাত্রে করবীর মুখে একটা আতঙ্কের চিহ্ন দেখেছিলাম, আজ সেসব কিছু নেই। বরং একটা তেজি অহংকারী ভাব। আমার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে আছে। ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে যেন, আমি একটি ভন্ড প্রতারক, কোনো ভদ্রমহিলার নামে মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছি।

কিন্তু আমার পক্ষে উত্তেজিত হওয়া এখন একেবারেই উচিত নয়। আমি নীচু গলায় বললাম, দেখুন, শুধু মিথ্যের বোঝা বাড়িয়ে আর কোনো লাভ নেই। বরং আপনি সব কথা খুলে বলুন, তাহলে আপনাকে আমরা হয়তো কোনো সাহায্য করতে পারি।

করবী বলল, আপনি কী বলছেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমি বললাম, হয়তো আপনার স্বামী পাটনায় শেষপর্যন্ত যাননি। তার কোনো বিপদ হয়ে থাকতে পারে।

একথা আপনি বলছেন কেন?

দারোগাবাবু একবারে চুপ। আস্তে আস্তে চায়ে চুমুক দিয়ে যাচ্ছেন। কথাবার্তা সব আমাকেই বলতে হচ্ছে। আমি এবার জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কাছে কি জিপগাড়িটার চাবি আছে, না আপনার স্বামী নিয়ে গেছেন?

করবী বলল, চাবি নিয়ে যাবে কেন? চাবি আমার কাছেই রেখে গেছে। চা

বিটা একবার দেখাবেন?

কেন বলুন তো?

হয়তো গাড়ির চাবিটা চুরি হয়ে গেছে—কাল কেউ চুরি করে জিপগাড়িটা নিয়ে গিয়েছিল কি না সেটা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার।

না, চুরি হয়নি।

করবী উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে গাড়ির চাবিটা নিয়ে এল। সেটা আমি নিয়ে দারোগাকে বললাম, এটা আপনার কাছে রাখুন।

করবীকে জিজ্ঞেস করলাম, তা হলে আপনি বলছেন গাড়িটা চুরি হয়নি?

না।

আপনি গাড়ি চালাতে জানেন?

না।

এবার আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে ধীরেসুস্থে বললাম, একটা ব্যাপার খুব মন দিয়ে শুনুন। কাল রাত্তিরে এই জিপগাড়িটা ডাকবাংলোর কম্পাউণ্ডে ছিল—আমি নিজে দেখেছি। সেটা যদি যথেষ্ট প্রমাণ না হয়—আজ সকালেও এই জিপগাড়িটাকে ডাকবাংলোর কাছে যেতে গ্রামের অনেক লোক দেখেছে, তারা সবাই সাক্ষী দেবে। আপনার স্বামীর অফিসের আর কেউ গাড়ি চালাতে পারে না। তা হলে এই জিপটাকে বাংলো পর্যন্ত কে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল? সেটা আপনার জানা উচিত, যেহেতু চাবি আপনার কাছে

করবী তীক্ষ্ণ গলায় বলল, আমাকে এইভাবে জেরা করার কী অধিকার আছে আপনার সেটা জানতে পারি কি?

দারোগাবাবু তখনও একেবারে চুপ। আমি পকেট থেকে নোটবইটা বার করলাম এইবার। কলমটা খুলে বললাম, অধিকারের প্রশ্ন পরে। দারোগাবাবু যতক্ষণ বাধা না দিচ্ছেন, ততক্ষণ আমি কতগুলো প্রশ্ন করে যাব। আপনি উত্তরগুলো ভেবেচিন্তে দেবেন। কারণ সেগুলো আমি লিখে রাখছি। এবং দারোগাবাবু তার সাক্ষী থাকছেন। এবার শুনুন। কাল রাত্রে আমি ডাকবাংলোয় যে-ঘরে ছিলাম, তার খাটের নীচে একটি ডেডবডি ছিল—সেটা কি আপনার স্বামী সুখেন রায়ের? আপনি জানলার বাইরে থেকে বলেছিলেন, আপনারই স্বামীর দেহ–

করবীর সিঁথিতে তখনও সিঁদুর জ্বলজ্বল করছে! আজ সকালেই স্নান করে নতুন করে সিঁদুর লাগিয়েছে। জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে তীব্র গলায় বলল, আপনি এইসব উদ্ভট কথা হঠাৎ আমাকে বলতে এসেছেন কেন? আমি আপনার কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি নই। আপনি অন্য কাকে দেখেছেন বা কোথায় কী দেখে এসেছেন-সে-সম্পর্কে আমি কিছু শুনতেও চাই না।

আমি বললাম, ডেডবডিটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। সেই ডেডবডিটা আপনি সরাতে গিয়েছিলেন, তাও দেখেছি। এই ঘটনা পুলিশের ওপর মহলে আমাকে জানাতেই হবে। আপনি আমার কথার উত্তর দিতে না চান—সেটা আলাদা কথা। পরে আপনাকে কৈফিয়ত দিতে হবেই।

দারোগাবাবু এতক্ষণ বাদে কথা বললেন। একটি বড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতের সিগারেটটি নিভিয়ে ফেললেন চায়ের কাপে। তারপর বললেন, করবী আর কোনো লাভ নেই। দি গেম ইজ আপ! এই ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা। তুমি সব কথা অস্বীকার করলে এঁকে পাগল ভাবতে হয়। সেটা উনি মেনে নেবেন কেন? তোমাদের ব্যাড লাক, ইনি মাঝখানে এসে পড়েছেন। আমাকেও তো চাকরি বাঁচাতে হবে। তাও বাঁচাতে পারব কি না জানি না।

করবীর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। এক ফুয়ে যেন কেউ নিভিয়ে দিল একটা মোমবাতি। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। সেটিকে খুব ঘৃণার দৃষ্টি বলা যায় না। দারুণ হতাশা, দারুণ দুঃখ মিশে আছে সেই দৃষ্টিতে। পুরো দু-তিন মিনিট তাকিয়ে রইল আমার চোখে চোখে। শেষপর্যন্ত আমিই চোখ সরিয়ে নিলাম।

খুব অস্ফুটভাবে করবী বলল, আমার স্বামী আত্মহত্যা করেছে। বিশ্বাস করুন। আমার স্বামী আত্মহত্যা করেছে।

করবীর প্রতি আমার কোনোরকম দয়া হল না। আমি বিদ্রুপের সুরে বললাম, প্রথমে জানা দরকার, যিনি মারা গেছেন, তিনি আপনার সত্যি সত্যি স্বামী কি না। স্বামী হোক

বা যে-ই হোক, আত্মহত্যা করার পক্ষে খুব চমৎকার পরিবেশ বটে। আপনি যখন ডেডবডিটা সরাবার চেষ্টা করেছিলেন, তখন আপনার সঙ্গে অন্য লোক ছিল, তারা কে?

করবী সে-কথার উত্তর না দিয়ে আবার বলল, বিশ্বাস করুন, আমার স্বামী আত্মহত্যা করেছে।

আমি দারোগার দিকে ফিরে বললাম, সুখেন রায়ের কী রিভলবার ছিল? সেটা আপনার জানার কথা।

দারোগাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, না, ছিল না। আমি ডেডবডির গলায় বুলেটের ক্ষত দেখেছি। এবং ডেডবডির কাছে কোনো রিভলবার ছিল না। এটি আত্মহত্যা?

দারোগা বললেন, করবী, আর মিথ্যেকথা বলে এঁকে ভোলাতে পারবে না। বললাম-না, ব্যাড লাক, তোমরা শক্ত মানুষের পাল্লায় পড়েছ। ডেডবডিটা কোথায়?

করবী কোনো কথা না বলে নি:শব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আমরা তাকে অনুসরণ করলাম। করবীকে এখন কিছুতেই চোখের আড়াল করা যাবে না। এ-মেয়ে অতি সাংঘাতিক, কখন কী করে বসবে, ঠিক নেই। এমনকী আত্মরক্ষার তাগিদে আমি আমার রিভলবারটা পকেটে শক্ত করে ধরে রইলাম। দারোগাবাবুর মুখ-চোখে একটা উদাসীন ভাব। পারতপক্ষে আর আমার দিকে তাকাচ্ছেন না। করবী একটার পর একটা ঘর পেরিয়ে যেতে লাগল। বসবার ঘরের পরেই বড়োঘর, তার পেছনে আর একটি ছোট্টঘর। সেই ঘরে খাটের ওপরে কফিনের আকারের একটি বড়ো কাঠের বাক্সের মধ্যে শোয়ানো রয়েছে ডেডবডিটা। চিনতে আমার দেরি হল না। একরাত আমি এর সঙ্গে একঘরে কাটিয়েছি। গলায় বুলেট বেঁধা সুখেন রায়ের মৃতদেহ। সেটা যে করবীর স্বামী সুখেন রায়েরই দেহ, অন্য কারুর নয়–সেটা দারোগাবাবুর মুখ দেখলেই বোঝা যায়। বডিটি আস্তে আস্তে ডিকমপোজ করতে আরম্ভ করেছে। পাছে দুর্গন্ধ টের পাওয়া যায়, তাই ঘরের মেঝেতে অনেকখানি ডেটল ছড়ানো।

আমি স্তম্ভিতভাবে তাকালাম করবীর দিকে। কী বিস্ময়কর এই মেয়েটি! স্বামীর মৃতদেহ ঘরের মধ্যে শোয়ানো। আর মেয়েটি স্নান করে সিঁদুর পরে আমাদের সঙ্গে গল্প করতে বসেছিল হাসিমুখে। আমি যদি সুর না বদলাতাম তা হলে এখনও হয়তো ওই গল্পই চলত।

করবীর মুখে কিন্তু কোনো ভাবান্তরই নেই, কিংবা তার তখনকার মুখের চেহারার বর্ণনা দিতে পারি, এমন ভাষাজ্ঞান নেই আমার। সে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে মৃত স্বামীর মুখের দিকে। তার ঘরসংসার, ভবিষ্যৎ সবই শেষ হয়ে গেল।

একটু বাদে করবী আস্তে আস্তে বলল, ওকে কবর দেবার সব ব্যবস্থা করে ফেলেছিলাম। কিন্তু সময় পেলাম না। ওর নিজের দোষেই ও মরেছে। ওর যদি হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে যায়, তার জন্য আমি কী করতে পারি!

দারোগাবাবু বললেন, থাক, এখন ওসব কথা থাক। ডেডবডিও থানায় নিয়ে যেতে হবে। করবী, তুমিও তৈরি হয়ে নাও। তোমাকে থানায় যেতে হবে।

আমি তৈরিই আছি।

সূরযলাল কোথায়?

আমি জানি না।

সূরযলাল পালিয়ে-টালিয়ে যায়নি তো?

আমি জানি না।

মাধবী হঠাৎ মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠল, দারোগাবাবু আগে থেকে সব জানত তার মানে? সেও কি ওদের সঙ্গে ছিল নাকি?

রঞ্জন বলল, আঃ! এমন বেটপকা কথা বল! সেটা বুঝতে পারছ না এখনও?

কর্নেল সেন মাধবীর দিকে তাকিয়ে বললেন, না, দারোগাবাবু ওদের সঙ্গে আসল ক্রাইমের সময় ছিলেন না বটে কিন্তু সবই জানতেন। ওরা সবাই দারোগাবাবুর পরিচিত। ডাকবাংলোর ঘরটায় আমি যখন ডেডবডিটাকে সঙ্গে নিয়ে, দরজা জানলা আটকে রয়েছি তখন ওরা কোনোক্রমেই সুবিধে করতে না পেরে, আমার আগেভাগে থানায় গিয়ে সব জানিয়েছিল—এবং দারোগাবাবুর পরামর্শ নিয়েছিল।

আমি যখন থানায় যাই, তখন দারোগাবাবু ইচ্ছে করে আমার সঙ্গে বেরোতে দেরি করেছেন। যাতে সেইসময় ওরা ডেডবডিটা সরিয়ে সব প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করার সুযোগ পায়। সেইজন্যই গাড়ি খারাপ-টারাপ ইত্যাদি ছুতো বার করছিলেন।

আর একটা জিনিসও আমি পরে বুঝতে পেরেছিলাম। ওরা যে খালের জলে আমার সুটকেসটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল—সেটাও নেহাত বোকামি করে নয়। তারমধ্যেও একটা উদ্দেশ্য ছিল। তখন পরিপূর্ণ দিনের আলো, সেইসময় ওরা জিপে করে এসে ডাকবাংলো থেকে সুখেন রায়কে নিয়ে যাবে—এটা কারুর না কারুর চোখে পড়বেই। সুখেনের মৃতদেহটা ওরা জিপের পেছনে এমনভাবে হেলান দিয়ে শুইয়ে এনেছিল যে, কেউ যেন চট করে বুঝতে না পারে যে, সে মরে গেছে। ওই জিপটাও গ্রামের লোকের চেনা। সুতরাং কেউ-না-কেউ আমাদের বলে দিতে পারত সেই কথা। সুটকেসটা ফেলে আসাও আমাদের দেরি করানোর চেষ্টা। ওরা সময়ের সঙ্গে রেস দিচ্ছিল। যেমন করে থাকে, আমাদের দেরি করিয়ে দিয়ে ডেডবডিটাকে পুঁতে ফেলতে পারলেই ওরা অনেকটা নিরাপদ হতে পারত। কোনো ডেডবডি পাওয়া না গেলে খুনের অভিযোগ টেকে না। ব্যাপারটা আমার এক রাত্তিরের দুঃস্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসেও ভাগ্য ওদের প্রতি বিরূপ হয়েছে। রাত্তির বেলা অন্ধকারে ওইরকম গ্রামাঞ্চলে একটা ডেডবডি পুঁতে ফেলা খুব শক্ত নয়—কিন্তু দিনের আলোয় অনেক অসুবিধে। ওরা স্থানীয় মুসলমানদের কবরখানায় একটা গর্ত খুঁড়ে রেখেছিল—সেই সময়েই আবার একটি মুসলমান শিশুকে সেখানে গোর দেওয়া হচ্ছে। কবরখানায় অনেক

লোকজন। এ-রকম আশঙ্কা ওদের মনে একবারও জাগেনি। কবরখানাটা নির্জন পড়ে থাকে সাধারণত। কিন্তু সেদিনই যে একটা বাচ্চাছেলে মারা যাবে আর ঠিক ওই সময়ই তাকে কবর দিতে আনা হবে—এ আর ওরা জানবে কী করে। এত চেষ্টা করেও ওরা শেষরক্ষা করতে পারল না। বাধ্য হয়ে ওদের ফিরে আসতে হয়। শেষপর্যন্ত ওরা নির্ভর করেছিল করবীর অভিনয় ক্ষমতার ওপরে। করবী যদি ভুলিয়ে-ভালিয়ে আমাদের ফেরত পাঠাতে পারে। স্নান করা সিঁদুর পরা একটি মেয়েকে দেখে কি কল্পনা করা সহজ যে, স্বামীর মৃতদেহ পাশের ঘরে শোয়ানো আছে?

মাধবী বলল, সত্যি বাবা, কল্পনাই করা যায় না। কোনো মেয়ে এ-রকম করতে পারে? আপনি কী করে সন্দেহ করলেন কে জানে!

কর্নেল সেন বললেন, আমি খেপে গিয়েছিলাম বলা যায়। ওরা সবাই মিলে এমন একটা ষড়যন্ত্র করেছিল, যেন আমি একটা পাগল। আগের দিন রাত্তিরে কিছুই ঘটেনি, ঘরের মধ্যে কোনো ডেডবডি ছিল না—সবই যেন আমি বানিয়ে বলছি। তাই আমি শেষ পর্যন্ত না দেখে ছাড়তে চাইনি!

রঞ্জন জিজ্ঞেস করল, তারপর কী হল?

কর্নেল সেন বললেন, ডেডবডির কাছে একজন কনস্টেবলকে পাহারায় বসিয়ে দারোগাবাবু করবীকে বললেন, চলো।

করবী সহজভাবে বলল, যাচ্ছি, চলুন। আমি এক গেলাস জল খেয়ে আসি।

আমি কিন্তু করবীকে চোখের আড়াল হওয়ার সুযোগ দিতে চাই না। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় জল আছে? আমি এনে দিচ্ছি, আপনি এখানে দাঁড়ান।

করবী অবাক হয়ে বলল, কেন, আপনি এনে দেবেন কেন?

আমি বললাম, বাড়িতে আর কেউ নেই? আপনার স্বামী চলে গেলে আপনি একা থাকেন?

করবীর বদলে দারোগাবাবু বললেন, একজন ঠিকে ঝি এসে কাজ-টাজ করে দিয়ে যায়, তাই-না? সে বোধ হয় এখন নেই।

করবী বলল, এঘরেই জল আছে। আমি নিজে গড়িয়ে নিচ্ছি।

কলসি থেকে করবী জল গড়ালো আমাদের দিকে পেছন ফিরে। আমি দ্রুত ওর কাছে গিয়ে বললাম, দাঁড়ান জলটা আগে খাবেন না। আমি আগে দেখব–

করবী পুরো এক মিনিট তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর হেসে উঠল শব্দ করে। হাসতে হাসতে বলল, ও, আপনি ভাবছেন আমি আত্মহত্যা করব? হা-হা-হা-। আপনি কিছু বোঝেন না। আমি মরতে চাই না–আত্মহত্যা করতে চাইলে অনেকদিন আগেই করতাম। ঠিক আছে, আমি জল খাব না–এই নিন দেখুন

করবী জলসুদ্ধু গেলাসটা ছুড়ে মারল আমার মুখের দিকে। আমি তাড়াতাড়ি মাথা সরিয়ে নিয়েছিলাম বলে গেলাসটা আমার চোখে লাগেনি, কিন্তু ঘাড়ে লাগল। করবী আমার চোখেই মারতে চেয়েছিল–আমার চোখই তো ওদের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী। বড়ো কাঁসার গেলাস, আমার ঘাড়ের কাছে একটু কেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল, জলে জামাকাপড় ভিজে গেল।

আমি করবীর চোখে-মুখে হিস্টিরিয়ার চিহ্ন দেখতে পেলাম। দারোগাবাবু তাড়াতাড়ি এসে করবীর হাত চেপে ধরে ধমক দিয়ে বললেন, এই করবী, কী হচ্ছে কী? এখন আর এসব করে কী লাভ হবে! তোমাদের ভরাডুবি হয়েছে। এখন চলো–সূরলাল কোথায়?

করবী খরচোখে তাকিয়ে বলল, সূরযলাল কে, আমি তা জানি না। আপনি কার কথা বলছেন?

দারোগাবাবু একটা ক্লান্ত নিশ্বাস ছাড়লেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, চলুন সূরলালকে—ধরা যাক। এমনিতে বড়ো ভালো ছেলে সূরযলাল—এরা ঝোঁকের মাথায় একটা কান্ড করে ফেলেছে—শাস্তি পেতেই হবে—মার্ডার ইজ মার্ডার–

করবী দৃঢ় গলায় বলল, আমার স্বামী আত্মহত্যা করেছে। কেউ তাকে খুন করেনি! এর সঙ্গে সূরযলালের কোনো সম্পর্ক নেই।

ঠিক আছে, এখন আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি তোমাদের জন্য ভালো উকিল ঠিক করে দেবখন!

করবী কিন্তু কিছুতেই আমাদের সঙ্গে সূরযলালের বাড়িতে যেতে রাজি হল না। একেবারে বেঁকে বসল। ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, তাকে মেরে ফেললেও সে সূরলালের বাড়িতে যাবে না। অথচ করবীকে একা রেখে যাওয়া কোনোমতেই উচিত নয়। দারোগাবাবু আমাকে বললেন, –তাহলে স্যার, আপনিই একটু থাকুন এখানে, ওকে চোখে চোখে রাখুন!

আমি ঘাড়ে হাত বুলিয়ে বললাম, আমি আর একা ওর সামনে থাকতে সাহস পাচ্ছি না।

করবী বিচিত্র গলায় হেসে বলল, ভয় নেই, আমি পালাবও না, আত্মহত্যাও করব না। আমি এখানেই থাকব।

দারোগাবাবু এবার আর কোনো খুঁকি নিলেন না—সেপাইকে ডেকে করবীর হাতে দড়ি বাঁধলেন, তারপর সেই অবস্থায় বসিয়ে রাখলেন জিপগাড়িতে। সেপাইটি সেখানে পাহারায় রইল।

সূরযলালকে ধরার জন্য খুব একটা হাঙ্গামা করতে হল না। কাছেই সূরলালের বাড়ি। স্থানীয় অবস্থাপন্ন কাঠের ব্যবসায়ীর ছেলে সে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়েস, দোহারা সুন্দর চেহারা। মুখে বেশ একটা সরল সরল ভাব আছে। ঠিক ক্রিমিনাল টাইপ সে নয়, গ্রাম্য বড়োলোকের ছেলে, বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় পড়ে বখে গেলে যা হয় আর কী!

সূরযলাল যেন আমাদের প্রতীক্ষাতেই ছিল। দাঁড়িয়েছিল দোতলার বারান্দায়। দারোগাবাবু গিয়ে ডাকতেই সে বেরিয়ে এল। পাজামা আর সিল্কের পাঞ্জাবি পরা। ফ্যাকাশেভাবে হেসে বলল, খেল খতম হো গিয়া?

আমার দিকে তাকিয়ে বলল, চলুন, স্যার। যা হবার সে হোবেই কেউ রুখতে পারবে না। ঠিক কি না?

দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করলেন হরিনাথ ফিরেছে? না এখনও পালিয়ে আছে?

সূরযলাল হাতজোড় করে বলল, আমি ওর কথা কিছু জানি না। বিশওয়াস করুন। হরিনাথের কথা জানি না।

ঠিক আছে! সে দেখা যাবে পরে। বুদ্ধুরাম কোথায় গেল?

সূরযলালের বাড়ির সামনেই একটা ইউক্যালিপটাস গাছের তলায় মাটিতে একটা লোক বসেছিল। ময়লা, হেঁড়াখোঁড়া খাকি প্যান্ট শার্ট পরা। দারোগাবাবু তাতে ডাকতেই সে হাউমাউ করে কেঁদে এসে বলল, সাহেব, আমি কিছু জানি না। আমি শুধু গাড়ি চালিয়েছিলাম। আমাকে ছেড়ে দিন, ঘরে আমার বালবাচ্ছা আছে!

দারোগাবাবু এক ধমক দিয়ে বললেন, চল ব্যাটা, বাড়ি থেকে জিপটা নিয়ে চল থানায়।

সূরযলালের বাড়ির লোকজন ততক্ষণে নেমে এসে ভিড় করেছে। একটি যুবতী মেয়ে কেঁদে কেঁদে বার বার দারোগাবাবুর হাত জড়িয়ে ধরতে লাগল। সম্ভবত সে সূরযলালের স্ত্রী। মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী। এক হিসেবে তাকে করবীর চেয়েও সুন্দরী বলা যায় কিন্তু করবীর মতন মানুষ পাগল করার ক্ষমতা বোধ হয় তার নেই। নইলে তাকে ছেড়ে তার স্বামী করবীর কাছে যাবে কেন? মেয়েটি কেঁদে ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে লাগল, কিছুতেই তাকে থামানো যায় না। সূরযলালের মা খুব বুড়ি, তিনি এসে অভিশাপ দিতে লাগলেন

আমাদের সবাইকে। সূরযলাল বলল, আর দেরি করছেন কেন দারোগাবাবু, চলেন, চলেন! ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই।

তোমরা কখনো কেউ এ-রকম পরিস্থিতিতে নিশ্চয়ই পড়োনি। খুবই অস্বস্তিকর অবস্থা। এতক্ষণ বাদে আমার নিজেকে একটু অপরাধী লাগতে লাগল। এরা সবাই ভাবছে, আমিই ওদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য দায়ী। আমিই এতগুলো সংসার ভেঙে দিচ্ছি। কিন্তু খুনের ষড়যন্ত্রে যারা লিপ্ত, তাদের তো শাস্তি পেতেই হবে!

আমি সবাইকে আমার গাড়িতে চাপিয়ে থানায় নিয়ে গিয়ে তুললাম।

৪. কর্নেল সেন গল্প থামিয়ে

কর্নেল সেন গল্প থামিয়ে নি:শব্দে চুরুট টানতে লাগলেন। ওঁর মুখটা একটু বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। একটা হাই তুলে বললেন, রাত বেশি নেই। এবার একটু শুয়ে পড়া যাক!

মাধবী বলল, কিন্তু কে খুন করল? ওই মেয়েটি, না সূরযলাল?

কর্নেল সেন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, রঞ্জন তাঁকে বাধা দিয়ে বলল, মামাবাবু, বলবেন না, বলবেন না। ফট করে এককথায় খুনির নাম বলে দিলে, এই ধরনের গল্পের কোনো মজা থাকে না। ডিডাকশান করে যদি না বেরিয়ে আসে–। এখনও অনেক কিছু জানতে বাকি আছে। সূরযলাল, বুদ্ধুরাম, হরিনাথ এদের কথা তো এইমাত্র শুনলাম। এদের সঙ্গে করবীর কী সম্পর্ক সেটা এখনও জানা হল না। তা ছাড়া খুনের একটা মোটিভ থাকে–

কর্নেল সেন বললেন, তাহলে সেসব আবার কাল হবে। আমার একটু ক্লান্ত লাগছে। এখন। অনেকক্ষণ বকবক করেছি।

রঞ্জন বলল, এখন প্রায় সাড়ে তিনটে বাজে। এখন আর শুয়ে লাভ নেই। ঘণ্টা কয়েক বাদেই ভোর হয়ে যাবে। বৃষ্টি থেমে গেছে। বাকি রাতটা গল্প করেই কাটানো যাক। আর এক কাপ করে কফি হবে নাকি?

মাধবী বলল, না, না, এতরাত্তিরে আর কফি খায় না!

রঞ্জন হাসতে হাসতে বলল, তোমাকে বানাতে হবে বলে ভয় পাচ্ছ তো? তোমাকে কিছু করতে হবে না। তুমি চুপ করে বসে থাকো। সুনীল বানিয়ে দেবে। সুনীল খুব ভালো কফি বানায়।

আমি বললাম, ভ্যাট। আমি এখন উঠতে পারব না। তুই নিজে যেতে পারছিস না? তোর নিজের বাড়ি–আর আমি কফি বানাব?

না, না, তুই ভালো বানাস কি না তাই বলছিলাম।

কফি বানানোর আবার ভালো আর খারাপ কী? আমি নিজে কোনোদিন বানিয়ে খাইনি–

রঞ্জন অনিচ্ছা সত্ত্বেও গা মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠে বলল, মামাবাবু, আপনি কফি খাবেন তো?

আপত্তি নেই।

জল চাপিয়ে এসে রঞ্জন বলল, মামাবাবু এবার বলুন, খুনের মোটিভ কী? খানিকটা অবশ্য বোঝাই যাচ্ছে–

কর্নেল সেন বললেন, আমি তো এতক্ষণ বললাম, এবার তোমরাই বলো-না, বাকিটা কী হতে পারে।

ঠিক আছে, আমরা সেটা চেষ্টা করব। আপনি আমাদের আর কয়েকটা তথ্য সাপ্লাই করুন। যেমন সুখেন রায় লোকটা কেমন ছিল—।

মাধবী বলল, ওই করবী বলে মেয়েটার শেষপর্যন্ত কী হল? ফাঁসি হয়েছিল?

কর্নেল সেন হেসে ফেলে বললেন, তার মানে তুমি ধরেই নিচ্ছ যে, করবীই খুন করেছিল?

রঞ্জন বলল, মাধবী, তুমি থামো তো! আগে মামাবাবুকে আর একটু বলতে দাও তারপর তো খুনি কে সেটা বুঝবে!

মাধবী বলল, আমায় আর কিছু বলতে হবে না। আমি ঠিক জানি, ওই মেয়েটাই খুন করেছে।

রঞ্জন বলল, আঃ তুমি থামো তো! এসব ক্রাইম-স্টোরি ফলো করা মেয়েদের কর্ম নয়! মামাবাবু, এটা কিন্তু আপনার ভারি অন্যায়! এতক্ষণ গল্প বেশ চলছিল, হঠাৎ গল্পের শেষ দিকে দুমদাম করে সূর্যলাল, হরিনাথ, বুদ্ধুরাম এই এতগুলো ক্যারেকটার এনে

ফেললেন! এদের সম্পর্কে আগে আভাস দেওয়া উচিত ছিল। খুনি কখনো লাস্ট দৃশ্যে আসে না।

কিন্তু আমি তো গল্প বানাতে জানি না। বানানো গল্প হলে লেখকরা ভেবেচিন্তে চরিত্র ঠিক করে। কিন্তু আমার জীবনে ব্যাপারটা যেভাবে ঘটেছিল, আমি সেইভাবেই বললাম। সূরযলাল বা হরিনাথ বা বুদ্ধুরামের কথা তো আমি নিজেও আগে জানতে পারিনি।

ওই দারোগাটির সঙ্গে ওদের কতখানি সম্পর্ক সেটাও ভালোভাবে জানা দরকার!

কর্নেল সেন বললেন, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত মানুষগুলো সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করার জন্য আমি তোমাদের আর একটু জানিয়ে দিচ্ছি। মামলা চলার সময় আমাকে বেশ জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল—তাই আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছিলাম। সব বলতে গেলে তো এক মহাভারত হয়ে যাবে। সংক্ষেপে কিছু কিছু বলছি।

সেদিন ওদের সবাইকে নিয়ে থানায় আসার পথে দারোগাবাবু আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, স্যার আমাকে ফাঁসাবেন না। আমার চাকরিটা অন্তত বাঁচিয়ে দেবেন। আমি নিতান্ত মায়ায় পড়েই কেসটা চেপে যেতে চাইছিলাম। নইলে আমার আর অন্য কোনো স্বার্থ নেই। বিশ্বাস করুন! আমি এদের সবাইকেই আগে থেকে চিনি। সুখেনকেও আমি স্নেহ করতাম। এরা ঝোঁকের মাথায় একটা কান্ড করে ফেলেছে, নইলে এরা কিন্তু কেউই মানুষ খারাপ নয়। আমি তাই ভেবেছিলাম, একজন যখন ঘরেই গেছে, তাকে তো আর বাঁচানো যাবে না—তবে শুধু শুধু এদেরও জীবনটা নষ্ট করে কী হবে, আর একটা সুযোগ যদি দেওয়া যায়—পুলিশ অফিসার হিসেবে কেসটা চেপে যাওয়ার চেষ্টা করে আমি অন্যায় করেছি ঠিকই। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এ ব্যাপারে আমার কোনো স্বার্থ নেই। টাকাপয়সার ব্যাপারও নেই। পুলিশ হলেও আমারও তো একটা মানুষের প্রাণ আছে। আমি ওদের ওপর মায়া করেই–

দারোগাবাবু একটা কথা অন্তত ঠিকই বলেছিলেন, ওরা কেউই ঝানু ক্রিমিনাল নয়। হত্যাকান্ড ঝোঁকের মাথাতেই হয়েছে। ওরা যদি খাঁটি ক্রিমিনাল হত তাহলে ওরা

আমাকেও ছাড়ত না। আমাকে মেরে ফেললেই ওদের ঝামেলা চুকে যেত। ওইরকম নির্জন ডাকবাংলোয় একটা খুনও যা, দুটো খুনও তাই, আমাকে মারার সুযোগও ওরা পেয়েছিল। ঘরের মধ্যে মেয়েটিকে দেখার পর আমি যখন খানিকটা অসাবধানভাবে বাইরে বেরিয়েছিলাম—তখন ওরা জিপের আড়ালে লুকিয়ে অনায়াসেই আমাকে গুলি করতে পারত। রিভলবার ছিল সূরযলালের কাছে। আমাকেও মেরে ফেলে দুটো লাশ একসঙ্গে পুঁতে ফেলায় ঝাট আর কী ছিল! আমি যে সেই রাত্রে ওই ডাকবাংলোয় থাকব—তা তো আর কেউ জানত না। কিন্তু কথায় কথায় মানুষ খুন করার অভ্যেস সত্যিই ওদের নেই। কিংবা, আমি মিলিটারির লোক বলেই ওরা ভয় পেয়েছিল কি না কে জানে। সত্যিকারের ক্রিমিনালরা অবশ্য ওইরকম অবস্থায় কিছুই পরোয়া করে না। সূরযলালের গান লাইসেন্স ছিল বটে কিন্তু সে ঠিকমতন রিভলবার চালাতে জানত কি না—সেটাই একটা সন্দেহের ব্যাপার। খুব ক্লোজ রেঞ্জে ফায়ার করা এককথা—আর দূর থেকে কারুকে গুলি করতে গেলে রীতিমতন প্র্যাকটিস থাকা দরকার।

সুখেন রায় লোকটি ছিল খুব নিরীহ আর শান্ত ধরনের। বেশ জনপ্রিয় ছিল সে। তার নম্র ব্যবহার আর বিদ্যেবুদ্ধির জন্য সবাই ভালোবাসত তাকে। খুবই গরিব পরিবারের ছেলে সে, কোনোরকমে লেখাপড়া শিখে চাকরি জুটিয়েছে। বউটিও তার সুন্দরী। সংসারে কোনো ঝামেলা নেই। লোকের চোখে সে মোটামুটি সুখী মানুষ। পেশায় ওভারসিয়ার হলেও তার ঝোঁক ছিল নানা রকমের বই পড়ার—সামান্য মাইনে পেলেও সে, সেই টাকার মধ্যে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে অনেক বই ও পত্রপত্রিকা আনত বাইরে থেকে।

সুখেন রায়ের বাড়িতে রীতিমতন একটা আড্ডা ছিল। আড্ডার অন্যতম আকর্ষণ ছিল অবশ্য, তার বউ করবী এবং করবীর হাতে বানানো চা। করবীর বিয়ে হয়েছিল খুব অল্পবয়সে। ষাোেলো বছর বয়সে তার বিয়ে হয়—তখন সে রোগা পাতলা একটি গ্রাম্য লাজুক মেয়ে। বিয়ের পর সুখেন রায় নানান জায়গায় বদলি হয়েছে—করবী সেইসব জায়গায় লোকজনের সঙ্গে মিশে আস্তে আস্তে বেশ চটপটে হয়ে উঠেছে। লোকজনের সঙ্গে মিশতে পারে, পুরুষদের আড্ডায় সমানে যোগ দিতে পারে। মফসসল জায়গায়

এ-রকম মেয়ে তো সহজে চোখে পড়ে না। অবিবাহিতা মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে আড্ডায় যোগ দিতে পারে না, আর বিবাহিতা মেয়েরা বাচ্চা-কাচ্চা সামলাতেই ব্যস্ত। করবীর ঝামেলাও ছিল না—তারপর সে একটু-আধটু গান-টানও গাইতে পারে।

এমনিতে সুখেন রায়ের সংসারটাকে সুখের সংসারই বলা যেতে পারত। স্বামী-স্ত্রীর ছোট্ট সংসার—খুব একটা অভাবের টানাটানি ছিল না। সুখেন রায়ের সংস্পর্শে থেকে করবী খানিকটা লেখাপড়াও শিখেছিল। বন্ধুবান্ধব আসে বাড়িতে, হইচই আনন্দ হয়—সব মিলিয়ে অভিযোগ করার মতন কিছু নেই।

কিন্তু ওই যে বললাম, কিছুক্ষণ আগে, করবী ঠিক সাধারণ মেয়ে নয়। তার স্বভাব ও শরীরের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা পুরুষদের মধ্যে আগুন জ্বালায়। সাধারণ শান্তশিষ্ট বাড়ির বউ হয়ে থাকবার মতন মেয়ে সে নয়। তা ছাড়া বিয়ের পর আট বছরের মধ্যেও তার কোনো ছেলেপুলে হয়নি। স্বাস্থ্য খুব ভালো। সব মিলিয়ে তার মধ্যে একটা ছটফটানি ছিল। ছোট্ট সংসারের গন্ডি ছাড়িয়ে সে উপচে পড়তে চাইত।

পুরুষরা আকৃষ্ট হত তাকে দেখে। এই ধরনের মেয়েদের দেখে প্রলুব্ধ হওয়ার মতন রসিক পুরুষের অভাব নেই কোনো দেশে। সুখেন রায় যেখানে যেখানে ট্রান্সফার হয়েছে, তার অনেক জায়গাতেই দু-একটা ছোটোখাটো গোলমাল হয়েছে করবীকে নিয়ে। সেজন্য কতটা দোষ করবীর আর কতটা অন্য পুরুষদের—তা বলা যায় না। সে একবার ধরাও পড়েছে সুখেনের কাছে, তখন করবী অনুনয় বিনয় করে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে। সুখেনই অনেক সময় ইচ্ছে করে বদলি হয়ে গেছে এক-এক জায়গা থেকে। লোকজনের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করার মতন স্বভাব সুখেনের নয়। যেখানেই দেখেছে কোনো লোক করবীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করতে চাইছে—সেখান থেকেই সে ট্রান্সফার নিয়ে চলে গেছে। কোনোক্রমে। বউকে কোনো শাস্তি দিতে চায়নি। আবার, তার বাড়িতে যে আড্ডা বসে, এটাও সে বন্ধ করে দিতে চায়নি কখনো, কারণ সে নিজেই আড্ডা দিতে ভালোবাসত। মোটকথা, স্ত্রীকে অসম্ভব ভালোবাসত সুখেন। তার এই ধরনের ছোটোখাটো দোষত্রুটিও সে ক্ষমা করতে পারত। করবীও স্বামীকে ভালোবাসত—একথাও

ঠিক। নইলে সুখেনকে ছেড়ে কখনো সে চলে যায়নি কেন? যেতেও তো পারত। সেরকম সুযোগও তার ছিল। সব মিলিয়ে করবী মেয়েটা অদ্ভুত ধরনের। স্বামীর প্রতি ভালোবাসাও ছিল তার আবার অতৃপ্তিও ছিল। অতৃপ্তিটা কখনো কখনো বেড়ে গেলেই গোলমাল দেখা দিত।

সুখেন তার স্ত্রীকে ছেড়ে কোথাও যেত না। টুরে যাওয়ার কথা সব বাজে। কোনোদিন সে স্ত্রীকে একলা বাড়িতে রেখে টুরে যায়নি, মৃত্যুর আগের দিনও না। করবীকে বাপের বাড়িতেও পাঠাত না সে-যদিও করবীর বাপের বাড়িতে বিশেষ কেউ ছিল না—তার বাবা মা, দু-জনেই মারা গেছে অল্পবয়সে। দাদার সংসারে মানুষ।

সূরযলালের সঙ্গে তার ঠিক কতখানি ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—তা জানা যায়নি শেষ পর্যন্ত। আদালতে হাজার জেরাতেও ওরা এ-সম্পর্কে একটি কথাও বলেনি—এমনকী সূরযলালই জোর করে করবীর দিকে ঝুঁকেছিল, না করবীই আকৃষ্ট করেছিল তাকে—তাও বলা যায় না। তবে, দু-জনের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ ছিল। সূরযলাল অনেকবার এসেছে ওদের বাড়িতে, সুখেনের উপস্থিতিতেই।

ব্যাপারটা তোমাদের পক্ষে, অনুমান করা নিশ্চয়ই শক্ত হবে না। সুখেনের বাড়িতে নিয়মিত আড্ডা বসত, তার সুন্দরী স্ত্রী করবী চা তৈরি করে খাওয়াত সবাইকে। আড্ডার লোভে না হোক, চায়ের লোভেই তো যেতে পারে অনেকে–

রঞ্জন ফস করে বলে উঠল, কিংবা যে বানিয়ে দেয় তার লোভেও কেউ কেউ যেতে পারে। আপনি যেরকম বলছেন, তাতে মেয়েটি–

কর্নেল সেন মাথা নীচু করে মৃদু হেসে বললেন, ব্যাপারটা বোধ হয় সেইরকমই দাঁড়িয়েছিল। ওই আড্ডার মধ্যে কেউ কেউ একটু ঝুঁকে পড়ে করবীর দিকে। সুখেন বোধ হয় সেদিকে নজর দেয়নি। অন্যান্য পুরুষমানুষদের মধ্যে সূরযলালই করবীকে বেশি আকৃষ্ট করতে পারবে। তার সুন্দর চেহারা, পয়সাকড়ি যথেষ্ট আছে, ফুর্তিবাজ। সুখেনকে লুকিয়েও যে সে করবীর সঙ্গে দেখা করত–

মাধবী ধড়ফড় করে উঠে পড়ে বলল, এই যা...। জল গরম হয়ে উথলে পড়ে যাচ্ছে–তোমার খেয়ালই নেই। তোমার দ্বারা যদি একটু কাজ হয়

রঞ্জন বলল, ও জল চাপিয়েছিলাম, না? যাও, যাও, কফি বানিয়ে নিয়ে এসো, এসব কী আর পুরুষমানুষের কাজ!

মাধবীর কফি বানিয়ে আনার অপেক্ষায় আমরা একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইলুম। মনে মনে আমি করবী নামে মেয়েটির চেহারাটা কল্পনা করার চেষ্টা করছিলাম। এই গল্পের প্রথম দিকে তার চরিত্রটা অনেকখানি রহস্যে মোড়া ছিল। এখন আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে আসছে। মেয়েটির জীবন তার সংসারকে ছাপিয়ে আরও বড়ো হয়ে উঠছিল। অন্য ধরনের পরিবেশে পড়লে কিংবা অন্য রকমের সুযোগ পেলে এই ধরনের মেয়েরাই দেশনেত্রী হয়, সমাজসেবিকা হয় কিংবা ফিলম স্টার বা ডাকাতদলের সর্দারনিও হতে পারে। যেসব মেয়ে সংসার ছাড়িয়ে আরও বড়ো হয়ে ওঠে, তারাই জীবনে বড়ো কিছু করে। এখানে, দুর্ভাগ্যবশত বেচারি অবৈধ প্রেম আর খুনখারাপির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে।

কফিতে চুমুক দিয়ে কর্নেল সেন বললেন, সূরযলাল সম্পর্কে বিশেষ কোনো বদনাম আগে শোনা যায়নি। তার বাবা কাঠের ব্যাবসা করে কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর সূরযলাল ব্যাবসার দিকে বেশি মন না দিয়ে টাকাপয়সা ওড়াবার দিকে মন দেয়। অল্পবয়েসেই বিয়ে হয় ওদের। স্ত্রীটি সুন্দরী, দু-টি বাচ্চাও আছে। কিন্তু ঘরে মন টেকে না সূরযলালের। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ফুর্তি করে, মদ-টদ খায়। তার মা এখনও বেঁচে আছেন বলে বাড়িতে ওসব চলে না–মাঝে মাঝেই বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বাইরে চলে যেত। এইসব সত্ত্বেও সূরযলালের মনটা উদার–অনেককে সে টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করেছে। কখনো কারুর কোনো ক্ষতি-টতি করেনি। মোটামুটিভাবে তার জীবনটা কেটে যেতে পারত–কিন্তু সুখেন রায় তার স্ত্রীকে নিয়ে ওই ছোট্ট শহরে বদলি হয়ে আসার ফলেই তার জীবনেও সব কিছুই বদলি হয়ে গেল। সূরলাল রাশি রাশি টাকার জিনিস কিনে উপহার দিয়েছে করবীকে। করবীও সেসব নিতে আপত্তি করেনি–।

কর্নেল সেন, মাধবীর দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্তত করে বললেন, সূরযলালের সঙ্গে করবীর অবৈধ মিলনের কোনো সুযোগ কখনো ঘটেছিল কি না তা জানা যায়নি। যদিও সূরযলালের বউ তার সাক্ষ্যে বলেছিল, ওই ডাইনিই তার স্বামীর সর্বনাশ করেছে।

এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত একজন লোকের শেষ পর্যন্ত আর পাত্তা পাওয়া যায়নি। তার নাম হরিনাথ।

এই হরিনাথ ছিল সুখেনের অফিসেরই সহকর্মী। কিন্তু সে সূরযলালের ফুর্তির সঙ্গী একজন। সূরলালের টাকায় আমোদ-আহ্লাদ করাই ছিল তার প্রধান কাজ। ঘটনার দিন রাত্রিতে সে ডাকবাংলোতে উপস্থিত ছিল। কিন্তু গুলি চলার পরই সে দৌড়ে পালিয়ে যায়। সেই যে পালিয়েছে, আর কেউ তার কোনো খোঁজ পায়নি। পুলিশ বহুচেষ্টা করেও ধরতে পারেনি তাকে—চাকরি-টাকরি সব ছেড়ে সে অবাক কান্ড করেই রইল।

এই তো শুনলে লোকগুলির পরিচয়। এবার তোমরা–

রঞ্জন জিজ্ঞেস করল, আর সেই বুন্ধুরাম?

কর্নেল সেন হাসতে হাসতে বললেন, সে কিছু না। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সূরযলাল বা করবী—কেউই গাড়ি চালাতে জানে না। সুতরাং ডেডবডিটা আর জিপগাড়িটা সরানোর জন্য একজন ড্রাইভার দরকার। এটা একটা মজার ব্যাপার। এটা থেকেই বুঝতে পারবে, কত ছোটোখাটো ঘটনার জন্য কত বড়ো বড়ো ব্যাপার ফাঁস হয়ে যায়। করবীর পক্ষে গাড়ি চালাতে না-জানা অস্বাভাবিক কিছু নয়—কিন্তু সূরযলাল বড়লোকের ছেলে—তাদের নিজেদের কোম্পানির দু-তিনটে ট্রাক আছে—সে তো গাড়ি চালাতে জানতেও পারত। তা হলেই, খুনের রাত্তিরেই সে ডেডবডিটা সরিয়ে ফেলতে পারত–আমি ডাকবাংলোয় গিয়ে কিছুই দেখতে পেতাম না। ওরা পুরো ঘটনাটাই চাপা দিতে পারত, বিশেষ করে দারোগাবাবুর সঙ্গে যখন ওদের খাতির। কিন্তু তা হতে পারল না। সুখেন রায় একমাত্র গাড়ি চালাতে জানত ওদের মধ্যে—সে মারা যাওয়ার পর গাড়ি চালাবে কে? এইজন্যেই সূরযলাল অনেক টাকাকড়ি দিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বুদ্ধুরামকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। তার

পরদিন লোকটার বুদ্ধিসুদ্ধিও কম–সে হয়তো কিছুই ফাঁস করত না শেষ পর্যন্ত। বেচারা তার পুরো টাকা পায়নি বলে সেই টাকার লোভে বসেছিল।

মাধবী জিজ্ঞেস করল, তাহলে কি ওই হরিনাথ নামের লোকটাই খুন করেছে?

রঞ্জন বলল, তা হতেই পারে না। মা

ধবী বলল, কেন হতে পারে না?

তার কারণ হরিনাথ বলে কোনো লোকের অস্তিত্বের কথা আমরা জানতুমই না। হঠাৎ গল্পের শেষের দিকে একটা লোকের কথা শোনা গেল। আর সেই খুনি হয়ে গেল।-এটা হয় না। ডিটেকটিভ গল্পে এটা খুব ব্যাড ফর্ম।

কর্নেল সেন বললেন, কিন্তু রঞ্জন, এটা তো গল্প নয়। জীবনের সব ঘটনা কি গল্পের নিয়ম মেনে চলে? আমি হয়তো ঘটনাটা ঠিকমতন সাজিয়ে বলতে পারিনি

মাধবী বলল, খুন না করলে ওই লোকটা পালাবে কেন? লুকিয়েই বা থাকবে কেন?

রঞ্জন বলল, ভয় পেয়ে পালিয়েছে। ওইসব কান্ডমান্ড দেখে ওর পিলে চমকে গিয়েছিল

কর্নেল সেন বললেন, লোকটা একেবারে চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে জন্মের মতন পালিয়ে গেল–এটা সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার নয়?

রঞ্জন নিরাশভাবে বললে, তা হলে মামাবাবু, আপনি বলছেন, ওই হরিনাথই খুন করেছে?

না, সে-কথা আমি বলছি না। আদালতেও সে-কথা বলা হয়নি। যে পালিয়ে যায়; তার প্রতিই বেশি সন্দেহ জাগে–সেইজন্যই হরিনাথের নামটা প্রথম মনে আসে। কিন্তু খুনের একটা মোটিভ থাকা চাই তো। সেই হিসেবে হরিনাথের পক্ষে খুন করার কোনো কারণই নেই বলতে গেলে। সে একটা সাধারণ ফুর্তিবাজ লোক। সূরযলালের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে মদ্য পান-টান করাই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। অবিবাহিত লোক, সংসারের কোনো

বন্ধনও নেই। লোকের মুখে আমি যা শুনেছি—হরিনাথের চেহারাটাও ছিল বেশ খারাপ-লম্বা শিড়িঙ্গে চেহারা, মুখের একপাশে একটা পোড়া দাগ। এইসব লোক সাধারণত নারীর প্রীতি বা ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়। অন্তত অবৈধ প্রেমের নায়ক হিসেবে এদের কল্পনা করা যায় না। তা ছাড়া, যতদূর জানা গেছে, মেয়েদের ব্যাপারে হরিনাথের দুর্বলতাও ছিল না বিশেষ। সুতরাং তার পক্ষে হঠাৎ সুখেন রায়কে খুন করার কোনো যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

হরিনাথের কোনো পুরোনো ক্রিমিনাল রেকর্ডও নেই। সম্ভবত জীবনে প্রথম চোখের সামনে একটা মানুষকে অপঘাতে মরতে দেখে তার মাথার গোলমাল হয়ে যায়। দেখেশুনে ভয়ের চোটে সে সেই যে এক দৌড় দেয়—কোথায় গিয়ে থেমেছে, তার ঠিক নেই। কিংবা হয়তো এখনও দৌড়োচ্ছে।

মাধবী বলল, তা হলে কে খুন করেছে বলুন! আর সাসপেন্স ভালো লাগছে না। রঞ্জন বলল, এখন না! বলে দিলেই তো সব ফুরিয়ে গেল!

কর্নেল সেন বললেন, আমি তো ঘটনাটা সব খুলে বললাম তোমাদের। লোকজনদেরও চিনিয়ে দিলাম। এই কাহিনির এই ক-জনই পাত্র-পাত্রী। এদের সম্পর্কে আমি যেটুকু জেনেছি তা সব-ই বলেছি তোমাদের। এর বাইরের আর কেউ এর সঙ্গে জড়িত নয়, অন্য কেউ খুন করেনি। এদের মধ্যে থেকেই খুনিকে খুঁজে নিতে হবে। এবার তোমরাই বলো কে খুন করেছে?

মাধবী সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমি ঠিক জানি, ওই মেয়েটাই খুন করেছে!

কর্নেল সেন, রঞ্জন আর আমি একসঙ্গে হেসে উঠলাম। রঞ্জন বলল, তোমার ওই মেয়েটার ওপর খুব রাগ তাই-না?

মাধবী বলল, নিশ্চয়ই! যে-মেয়ে স্বামীর মৃতদেহ পাশের ঘরে রেখে নিজে বাইরের লোকের সঙ্গে হেসে গল্প করতে পারে—সে সব পারে!

আমি বললাম, মাধবী, তোমাকে যদি বিচারকের আসনে বসিয়ে দেওয়া হত–তাহলে তুমি নিশ্চয়ই মেয়েটাকে ফাঁসি দিতে, তাই-না?

দিতুমই তো!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা মাধবী, তুমি যে বলছ করবীই খুন করেছে, কিন্তু কীভাবে খুন করেছে, সেটাও তো তোমাকে বলতে হবে। শুধু শুধু একজনকে খুনি বললেই তো আর হয় না!

মাধবী বলল, এ তো খুব জলের মতন বোঝাই যাচ্ছে। ওই অসভ্য পাজি মেয়েটার সঙ্গে সূরযলালের নিয়মিত দেখা হত গোপনে। সুখেন কখনো অফিসের কাজে বাইরে গেলে তো আর কথাই নেই! সেবার যখন সুখেন বাইরে গেল–

রঞ্জন বলল, সুখেন তো আসলে যায়নি বাইরে–

আঃ, আমাকে বলতে দাও না! সুখেন পাটনায় যাওয়ার নাম করে বাইরে লুকিয়ে-টুকিয়ে ছিল। সূরযলাল রাত্তিরে ওদের বাড়িতে যেই এসেছে–সুখেনও ঢুকে পড়েছে। ধরা পড়ে গিয়ে বেগতিক দেখে করবী অমনি সূরযলালের পিস্তল নিয়ে গুলি চালিয়ে দিয়েছে। ও মেয়ে সব পারে!

আমি বললুম, কিন্তু মাধবী, এর সঙ্গে ডাকবাংলোর সম্পর্ক কী? ঘটনাটা ওদের বাড়িতে ঘটে ডাকবাংলোয় ঘটল কেন? করবীর পক্ষে বাড়িতে থাকাই তো সুবিধেজনক!

বাড়িতেই তো হয়েছে। তারপর ডেডবডিটা ডাকবাংলোয় নিয়ে কিছু একটা করার মতলব ছিল।

মাধবী, আগাথা ক্রিস্টি তোমাকে দেখলে লজ্জা পেতেন! মেয়েরা এমন ভালো ডিটেকটিভ গল্প লিখতে পারে, আর তোমার এই বুদ্ধি।

রঞ্জন বলল, তোমার মেয়েটার প্রতি একটুও সহানুভূতি হচ্ছে না? আমার কিন্তু একটু একটু হচ্ছে।

তা তো হবেই! তোমরা পুরুষমানুষরা...

আর এক দফা হেসে রঞ্জন আমার দিকে তাকিয়ে বলল, সুনীল, তুই বল কে খুন করেছে।

আমি বললাম, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তুই বল না!

রঞ্জন বলল, আমার ধারণা, এই ঘটনায় করবীর ভূমিকাটা একটু বড় করে দেখানো হচ্ছে। আসলে এরমধ্যে টাকাপয়সার কোনো ব্যাপার জড়িত। সূরযলাল, সুখেন, হরিনাথ, বুদ্ধুরাম আর ডাকবাংলোর চৌকিদার এরা সবাই মিলে কোনো অবৈধ ব্যাবসার সঙ্গে জড়িত ছিল। এসব জায়গায় এ-রকম হয়। ওই ব্যাবসার ব্যাপারেই কোনো গোলমাল হয়, সুখেন বোধ হয় ব্রিট্রে করেছিল—তাই সূরযলাল আর অন্যরা মিলে সুখেনকে মেরে ফেলে। তারপর সূরযলালই কোনো বুদ্ধি খাটিয়ে করবীকে ওই ডাকবাংলোয় ডেকে নিয়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ফেলে খুনের ঘটনার সঙ্গে। করবী তখন নিজে বাঁচবার জন্যই বাধ্য হয়ে সহযোগিতা করে ওদের সঙ্গে। মামাবাবু যে সুখেনকে ভালো লোক বলছেন, তারই বা প্রমাণ কী! বাইরে থেকে দেখে অনেককে ভালো মনে হয়। সুখেনই হয়তো নিজের বউকে অন্যদের সামনে এগিয়ে দিত।

কর্নেল সেন বললেন, রঞ্জন, তোমার থিয়োরিটা একেবারে অবাস্তব। এটা চমকপ্রদ বটে কিন্তু একটুও সত্যি নয়। ওদের মধ্যে কোনো ব্যাবসার সম্পর্ক যে ছিল না সেটা আমি ভালোভাবেই জেনেছি।

রঞ্জন হতাশ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, সুনীল, তুই তা হলে বল!

আমি বললাম, আমি ভাই পারব না। আমি ধাঁধার উত্তর দিতে পারি না একদম।

ধাঁধা কোথায়? লজিক্যাল অ্যানালিসিস করলেই তো পাওয়া যায়।

ওইটাই যে আমি পারি না। আমি যখন ডিটেকটিভ গল্প-টল্প পড়ি—কোনোদিন আগে থেকে বুঝতে পারি না খুনি কে-। তা ছাড়া মানুষকে চেনা অত সহজ নয়। কোন মানুষ কখন কীরকম ব্যবহার করবে—তা কেউ বলতে পারে না। আমার তো মনে হচ্ছে, ওদের মধ্যে যে-কেউ খুন করতে পারে—করবী, সূরযলাল—এমনকী হরিনাথের পক্ষেও কোনো কারণে খুন করা অসম্ভব নয়। তার মনের মধ্যে কী জটিলতা ছিল, তা তো আমরা জানতে পারব না। বুদ্ধুরামও যদি খুন করে, তাতেও অস্বাভাবিক কিছু নেই।

কর্নেল সেন বললেন, এরকমভাবে ভাবলে অবশ্যই সবাইকেই সন্দেহ করতে হয় কিংবা কোনো মানুষকেই সন্দেহ করা যায় না। একথা ঠিক, বাইরে থেকে দেখে আর মানুষকে কতটা বোঝা যায়। ভেতরে ভেতরে মনের মধ্যে তার কী খেলা চলছে, সেটা কেউ জানতে পারে না। তবে, অন্য একটা দিক থেকেও রহস্য সমাধানের চেষ্টা করা যায়। ক্রাইমের সময় এবং ঘটনাটা যদি রি-কনস্ট্রাক্ট করা যায়, তাহলে ব্যাপারটা অনেকটা সহজ হতে পারে। আমি যেদিন ডাকবাংলোতে হাজির হয়েছিলাম—তার আগের রাত্তিরে অর্থাৎ যেসময় খুনটা হয়েছিল—সেই সময়কার ঘটনা যদি কল্পনা করা যায়—তাহলে খুনিকে সহজেই দেখতে পাওয়া যাবে। চরিত্রগুলো যদি চেনা হয়ে যায়, তা হলে তাদের ব্যবহার কীরকম হবে, সেটাও অনেকটা কাছাকাছি আন্দাজ করা যায়। কোনো মানুষই তার স্বভাববিরুদ্ধ ব্যবহার সহজে করে না। বাইরে ভালো মানুষ আর ভেতরে ভেতরে হিংস্র শয়তান-এ-রকম লোকের সংখ্যা খুবই কম। অনেক উত্তেজক ডিটেকটিভ গল্পে পড়েছি—প্রথম দিকে ঘটনাটা যা মনে হয়েছিল শেষের দিকে তার সম্পূর্ণ একটা উলটো ব্যাখ্যা দেওয়া হল। রঞ্জনও সেই টেকনিকেই বলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু আমার মনে হয়, বাস্তবে ওরকম ব্যাপার খুব কমই ঘটে। আমি তোমাদের যে ঘটনা বললাম, এটা কিন্তু পুরোপুরি বাস্তব—এরমধ্যে অদ্ভুত অপ্রাকৃত কিছু নেই। আগের রাত্রে কী কী ঘটেছিল, সেটা টুকরো টুকরোভাবে আমি বলে দিতে পারি। কিন্তু পুরো ছবিটা ফুটিয়ে তোলার জন্য ক্ষমতার দরকার। সে-ক্ষমতা আমার নেই। সুনীল তুমি তো গল্প-উপন্যাস লেখো—তুমি কল্পনায় সেই রাত্তিরটার একটা ছবি ফোটাতে পারবে না?

আমি বললাম, গল্প-উপন্যাস লেখা এককথা আর অন্যের মুখে একটা ঘটনা শুনে সেটাকে বাস্তবের মতন ভাবা একটা অন্য ব্যাপার। আমি বোধ হয় এটা পারব না।

রঞ্জন বলল, পারবি, চেষ্টা কর-না।

মাধবী বলল, হ্যাঁ, আপনি বলুন। আপনার যদি ভুল হয়, আমরা ধরে দেব।

রঞ্জন বলল, এইরকমভাবে আরম্ভ করো। ডাকবাংলোয় কে আগে গিয়েছিল সুখেন, না করবীর সঙ্গে সূর্যলাল–

৫. ওদের পীড়াপীড়িতে শেষপর্যন্ত

ওদের পীড়াপীড়িতে শেষপর্যন্ত আমাকেই গল্পের বক্তার ভূমিকা নিতে হল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি চরিত্রগুলোর কথা ভেবে নিলাম। সূরযলাল-হঠকারী বড়োললাকের ছেলে, ইয়ারবন্ধুদের পাল্লায় পড়ে টাকা ওড়াচ্ছে। সুখেন রায়–শান্তশিষ্ট বইপড়া যুবক, বাড়িতে পুত্রহীনা সুন্দরী স্ত্রী। করবী তার স্বামীকে ভালোবাসে–অথচ ছোট্ট সংসারের একঘেয়ে জীবনে মন টেকে না। হরিনাথ অন্যের পয়সায় মদ খায়–সুখেনকে অপছন্দ করার যথেষ্ট কারণ আছে তার। নিজের চরিত্রের বিপরীত ধরনের লোক দেখলেই অনেকের রাগ হয়। চৌকিদার রামদাস

আমি মুখ তুলে বললাম, কর্নেল সেন, আমার আরও দু-একটা ব্যাপার জেনে নেওয়ার আছে। চৌকিদার রামদাস কি বিবাহিত? আপনি পরে নিশ্চয়ই খবর পেয়েছিলেন।

হ্যাঁ, পেয়েছিলাম। চৌকিদারের বউ মারা গিয়েছিল অনেক দিন আগে। সে একা থাকত।

কিন্তু আপনি যখন তার ঘরের দরজা ঠেলেছিলেন, তখন দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল।

তাই ছিল।

অর্থাৎ ঘরের মধ্যে কেউ লুকিয়েছিল। আপনি সেসময়ে ও ব্যাপারে মনোযোগ দেননি। আর একটা কথা। এই গল্পের মধ্যে ডাকবাংলোটার বেশ অনেকখানি ভূমিকা আছে। কেননা, সুখেন, করবী আর সূরযলাল এরা স্থানীয় লোক–ডাকবাংলো ব্যবহার করে বাইরে থেকে যারা আসে। তা ছাড়া সুখেন, করবী আর সূরযলাল এরা থাকে কাছাকাছি বাড়িতে। সুখেন যদি ট্যুরের নাম করে অন্য কোথাও গিয়ে থাকে, তাহলে তার বাড়িতে এসব ঘটনা ঘটাই স্বাভাবিক ছিল। তবু, ডাকবাংলোটার ভূমিকা আমি আন্দাজ করতে পারি। কারণ আমি ওই ধরনের বাংলোতে অনেকবার থেকেছি। রঞ্জনের অভিজ্ঞতা আছে।

আচ্ছা, সুখেন রায় যে বাড়িটাতে থাকত সেই বাড়িটা, আপনি বলেছেন, খুব ভালো নয়। ঠিক কীরকম? বৃষ্টি হলে ছাদ থেকে জল পড়তে পারে?

কর্নেল সেন হেসে বললেন, তুমি ঠিক লাইনেই এগোচ্ছ। হ্যাঁ, সুখেনের বাড়িটা ওইরকমই।

কর্নেল সেনের কাছে প্রশ্ন করে আমি আরও কয়েকটা তথ্য জেনে নিলাম।

তারপর আর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি পটভূমিটা মনে মনে ছকে নিলাম। আস্তে আস্তে চরিত্রগুলো আমার চোখের সামনে নড়াচড়া করতে লাগল। গল্প-উপন্যাস লেখার সময় আমি চরিত্রগুলোকে যেমন রক্ত-মাংসের চেহারায় কিছুক্ষণ দেখে নিই, তাদের সঙ্গে কথা বলি—এখানে সুখেন, করবী, সূরযলাল, রামদাস প্রভৃতির সঙ্গে আমার একে একে পরিচয় হল, আমি যেন, চেনাশোনা লোকদের মতনই ওদের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। মুখ তুলে এবার কর্নেল সেনের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, দেখুন, দেখুন, সেই সন্ধ্যেবেলার দৃশ্যটা আমি ফুটিয়ে তুলতে পারি। কিন্তু তাতে এই রহস্যকাহিনির কোনো সমাধান হবে কি না জানি না!

মাধবী বলল, ঠিক আছে আগে শুনেই দেখি-না।

আমি শুরু করলাম।

বিহারের ওইধরনের ছোটোখাটো শহরে শীতকালে যারা থেকেছে, তারাই বুঝতে পারবে কীরকম দুর্দান্ত শীত পড়ে, ড্রাই কোল্ড যাকে বলে। হাড় কনকনিয়ে দেয়। যে-সময় ঘটনাটা ঘটেছিল, সেটা যদিও নভেম্বর মাস, খুব বেশি শীত পড়ার কথা নয়, কিন্তু বৃষ্টি পড়লে ওসব জায়গায় নভেম্বরেও খুব শীত লাগতে পারে।

সেদিন সন্ধ্যে থেকেই বৃষ্টি পড়ছিল। সেইসঙ্গে কনকনে হাওয়া। কর্নেল সেন, আপনিই বলেছেন যে, পরের দিন আপনি যখন ডাকবাংলোতে গিয়েছিলেন, তখনও টিপটিপ করে

বৃষ্টি পড়ছিল। সুতরাং তার আগের দিনও বৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। মোটকথা, আমি ধরেই নিচ্ছি যে, বৃষ্টি পড়ছিল সেই সন্ধ্যেবেলা–তাতে আমার গল্পের সুবিধে হয়।

মাধবী বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ধরুন-না, কে আপত্তি করছে?

সুখেন তার বসবার ঘরের চৌকিতে শরীর এলিয়ে বই পড়ছে।

এইসব ছোটোখাটো জায়গায় সন্ধ্যের পরে আর কেউই থাকে না। বৃষ্টির জন্য সেদিন আর কেউ আড্ডা দিতেও আসবে না।

করবী এঘরে-ওঘরে একবার যাচ্ছে আর একবার আসছে। কখনো একটু বসছে সুখেনের পাশে আবার উঠে যাচ্ছে ভেতরে। তার কোনো কাজ নেই। সন্ধ্যেটা আর কাটতেই চায় না। দু-জন মানুষের রান্না, তাও কখন শেষ হয়ে গেছে। সুখেনের মতন তার বই পড়ার অত নেশা নেই।

করবী একবার বসবার ঘরে ঢুকে সুখেনকে বলল, এখন খেয়ে নেবে?

সুখেন বই থেকে মুখ তুলে বলল, এক্ষুনি? ক-টা বাজে?

টেবিলের ওপর রাখা হাতঘড়িটা দেখে বলল, মাত্র সাতটা। এরমধ্যেই খেয়ে নেব!

সুখেনের মুখটা শুকনো। সেদিন তাকে খানিকটা মনমরা দেখাচ্ছিল। এক হাতে বই, এক হাতে সিগারেট–মাঝে মাঝেই সে অন্যমনস্ক হয়ে তাকাচ্ছিল বাইরের দিকে। অফিস থেকে পাটনা যাওয়ার জন্য ছুটি নিয়েছে, অথচ পাটনায় যাওয়ারও ইচ্ছে নেই তার।

করবী বলল, হ্যাঁ তাড়াতাড়ি খেয়েই নাও। আমি আজ রাত্তিরে এখানে থাকব না।

সুখেন বলল, আজ আবার বেরোবে? আজ থাক-না–

করবী বলল, না, আজ আমার এখানে থাকতে ভালো লাগছে না। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি!

সুখেন বলল, আজ রাত্তিরে আর বেরিয়ে কাজ নেই। কালকে বরং তুমি আমার সঙ্গে চলো পাটনায়।

সে কালকের কথা কালকে। আজ রাত্তিরে আমার একটুও থাকতে ইচ্ছে করছে না এখানে। তোমাকে কত করে বলছি, আর একটা বাড়ি দেখো—

আজকের রাতটা অন্তত...

করবী বলল, না, চলো। বৃষ্টি পড়ছে, বেশিজোরে বৃষ্টি নামলে আবার আজ ছাদ থেকে জল পড়বে।

আজ আমার শরীরটা ভালো নেই, গা ম্যাজম্যাজ করছে—আবার গাড়ি চালাতে হবে—

কী হয়েছে কী! জ্বর হয়েছে নাকি?

করবী স্বামীর কপালে হাত রাখল। তারপর বলল, জ্বর তো নেই। চলো, ওখানে গিয়ে আরাম করে শোয়া যাবে। এই শীতের মধ্যে—

তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ল! সামান্য দু-একটা টুকিটাকি জিনিস সঙ্গে নিল শুধু। বিছানাপত্তর ডাকবাংলোতেই সব আছে। মাঝে মাঝেই ওরা বাড়ি ছেড়ে ডাকবাংলোয় এসে থাকে। ওদের নিজের বাড়ির থেকে ডাকবাংলোয় থাকা অনেক বেশি আরামপ্রদ, বিশেষত শীতকালে।

নির্জন জায়গার ডাকবাংলোতে এসব ব্যাপার খুব স্বাভাবিক। বাইরের লোকজন সেখানে কম আসে, সেখানে স্থানীয় সরকারি অফিসের কোনো কর্মচারীই পাকাপাকি বাসিন্দা হয়ে যায়। একটা ঘর শুধু খালি থাকে। এইসব বাংলোতে আবার অনেক সময় অসামাজিক

লোকদেরও আড্ডা হয়। চৌকিদারকে বকশিশ দিয়ে কিংবা ভয় দেখিয়ে তারা সন্ধ্যের পর এসে আড্ডা জমায়, মদ্যপান করে মেয়েদের নিয়ে অবৈধ কান্ডকারখানার পক্ষেও বেশ সুবিধাজনক জায়গা। আমাদের গল্পের এই বাংলোটা সেই ধরনের।

রঞ্জন ফস করে জিজ্ঞেস করল, তুই কী করে বুঝলি যে, সেই বাংলোটা এই ধরনের? তুই কি সেখানে গেছিস? বাংলোটা কোন জায়গায় তার নামই তো আমরা কেউ জানি না।

আমি বললাম, আমি সে বাংলোতে যাইনি বটে। কিন্তু সব কিছু শুনে মনে হচ্ছে বাংলোটা এই ধরনেরই। এ-রকম অনেক বাংলো আমি দেখেছি—সেখানে স্থানীয় কোনো সরকারি কর্মচারী নিজের কোয়ার্টার বানিয়ে নিয়েছে একেবারে।

কর্নেল সেন বললেন, সুনীলকে বাধা দিয়ো না। আমার মনে হচ্ছে, সুনীল ঠিক রাস্তাতেই এগোচ্ছে। এ-পর্যন্ত যা বলেছে, তা মিলে যাচ্ছে-তুমি বলে যাও-

করবী আর সুখেন যখন পৌঁছোললা, তখন সেই বাংলোয় আগে থেকেই আরও লোক এসে রয়েছে। সাধারণত, বাংলোতে যদি অন্য লোক এসে যায়, তাহলে আর করবীরা সেখানে সে-দিন থাকে না। ফিরে যায়। এতটা এসে আবার ফিরে যেতে হবে বলে সুখেন বিরক্ত হয়ে উঠছিল, এমন সময় দেখতে পেল, যারা এসেছে, তারা ওদের চেনা লোক। ওদের চেনা সূরযলাল আর হরিনাথ মদের বোতল নিয়ে আড্ডা জমিয়েছে। সূরযলালের বাড়িতে ওসব চলে না, তাই সে ডাকবাংলোতে আসে মাঝে মাঝে। চৌকিদার রামদাস তাদের খাবার-টাবার বানিয়ে দেয়-সূরযলাল কথায় কথায় বকশিশ দেয় পাঁচ টাকা দশ টাকা।

সুখেন আর করবীকে দেখে সূর্যলাল হই হই করে উঠল। এমনভাবে সে আপ্যায়ন করতে লাগল যেন বাংলোটা তার নিজের। হাত বাড়িয়ে বলল, আইয়ে, আইয়ে ভাবিজি, আইয়ে সুখেন দাদা-আজ কত সৌভাগ্য আমাদের যে, আপনারা এসেছেন-

সুখেন বলল, আমরা এসে ডিস্টার্ব করলাম না তো?

কী যে বলেন?

সুখেন নম্র ধরনের মানুষ। সে ইচ্ছে করলে চৌকিদারকে হুকুম দিয়ে বাংলোতে এই ধরনের লোকদের আসা বন্ধ করে দিতে পারে। তার বদলে সে নিজেই সংকুচিত হয়ে রইল।

একটা চেয়ারে আরাম করে বসে, আর একটা চেয়ারে পা তুলে দিয়েছে সূরযলাল। ছোটো টেবিলে দু-টি মদের বোতল ও কয়েকটি গেলাস। হরিনাথ ঠিক অনুগত ভৃত্যের মতন সূরযলালকে গেলাসে মদ ঢেলে দিচ্ছে, জল মেশাচ্ছে। হরিনাথ নিজেই খেয়ে ফেলেছে। অনেকটা। সে সুখেন আর করবীকে দেখে বলল, এই যে, দাদা আর বউদিও এসে গেছেন। তাহলে জমবে ভালো আজ!

করবী ওদের সঙ্গে একটাও কথা বলল না। চলে এল তাদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে। ভুরু কুঁচকে স্বামীকে বলল, ওরা আবার এখানে কেন? ওদের চলে যেতে বলো।

করবী বেশ গলা উঁচু করেই কথা বলছিল। সুখেন ফিসফিস করে বলল, এই আস্তে! যা :, তা কী বলা যায়! থাক-না!

করবী বিরক্ত হয়ে বলল, ধ্যাৎ! ভালো লাগে না। এখানে একটু নিরিবিলিতে ঘুমোতে এসেছি—তারমধ্যে আবার জ্বালাতন। ওরা সারারাত হইহল্লা করবে

না, না, সারারাত থাকবে না! খানিকটা বাদে চলে যাবে নিশ্চয়ই!

মোটেই যাবে না! দেখো তুমি।

এর আগেও দু-একবার সুখেন আর করবী ডাকবাংলোতে এসে সূরযলালদের দেখতে পেয়েছে। তবে, আগে যখন আলাপ পরিচয় ততটা বেশি ছিল না, তখন সুরযলাল সুখেনকে খানিকটা সমীহ করত। ওরা এলে ডাকবাংলো ছেড়ে চলে যেত তাড়াতাড়ি।

মাস খানেক আগে এক রাত্তিরে ওরা রাত তিনটে পর্যন্ত ছিল—শেষপর্যন্ত সুখেনই ওদের জিপে পৌঁছে দিয়ে আসে।

করবী বলল, তুমি কিন্তু আজ ওদের পৌঁছে দিয়ে আসতে যাবে না কিছুতেই। একা একা থাকতে আমার ভয় করে। ওদের বলো তাড়াতাড়ি চলে যেতে—এখন বেশি রাত হয়নি, হেঁটেই চলে যেতে পারবে।

করবী বেশ রেগে গেছে। সুখেন তার পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করল। সুখেনের ভদ্রতাবোধ আছে। সে মুখ ফুটে ওদের চলে যেতে বলতে পারবে না।

দরজার বাইরে থেকে সূর্যলাল বলল, এই সুখেনদাদা, আসুন একটু গপসপ করি। এক্ষুনি কি নিদ যাবে নাকি?

সুখেন করবীকে বলল, একটু বাইরে গিয়ে ওদের সঙ্গে বসা যাক। মোটে তো সাড়ে আটটা বাজে!

করবী বলল, তুমি যাও। আমার ভালো লাগছে না।

সুখেন বাইরের বারান্দায় ওদের সঙ্গে এসে বসল। কয়েকখানা চেয়ার বাইরে বার করা হয়েছে। ইচ্ছে করেই আলো জ্বালেনি। বৃষ্টি পড়ছে অশ্রান্তভাবে। কোথাও কোনো শব্দ নেই। চাদরমুড়ি দিয়ে চেয়ারে পা গুটিয়ে বসতে বেশ আরাম লাগে।

সূরযলাল মদের বোতল দেখিয়ে বলল, দাদা, একটু খাবেন নাকি?

সুখেন বলল, না ভাই, আমি ওসব খাই না। আমার ভালো লাগে না।

হরিনাথ এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। এবার হেসে উঠে বলল, না খেলে বুঝলেন কী করে যে ভালো লাগে না। আগে খেয়ে দেখুন, তবে তো বুঝবেন!

সুখেন বলল, না, তার দরকার নেই।

হরিনাথ নিজের গেলাসের সবটুকু মদ ঢক করে শেষ করে দিয়ে বলল, ওফ গলা জ্বলে গেল! মাইরি সুখেনদা, এ জিনিস খেলেও যেমন কষ্ট, না খেলেও সেরকম কষ্ট। তবে, বুঝবেন, খেয়ে কষ্ট পাওয়াটাই বেটার। আর সব কিছু ভুলিয়ে দেয়।

সুখেন জিজ্ঞেস করল, হরিনাথ, তুমি কোথা থেকে এসব খাওয়া শিখলে?

হরিনাথ হো- হো করে হেসে উঠে বলল, এসব কি কারুকে শেখাতে হয়? ভালোবাসা কি কারুকে শেখাতে হয়? মানুষ আপনি আপনি ভালোবাসে।

আমি তো আপনি আপনি শিখলাম না!

আপনি চেষ্টা করলেন না তা, শিখবেন কী! মেয়েমানুষ ছাড়া যেমন ভালোবাসা জমে না–

সূরযলাল ততক্ষণে আর একটা গেলাসে খানিকটা মদ ঢেলে জল মিশিয়ে বলল, নিন দাদা, একটু চেখে দেখুন! ভাবিজি রাগ করবেন বলে ভয় পাচ্ছেন? হা-হা–

না, না, তারজন্য নয়।

ভাবিজির কাছে পারমিশন সিক করে লিন।

ও কিছু বলবে না। এমনিই আমি খাব না–।

সুখেন আড়চোখে তার ঘরের জানলার দিকে তাকাল। জানলা দিয়ে আলো এসে পড়েছে। বাইরে। করবী শুয়ে পড়েনি, বোঝাই যায়। ঘরের মধ্যে তার চলাফেরার খুট-খাট শব্দ। সুখেন মনে মনে শঙ্কিত হল, করবী বোধ হয় রেগে যাচ্ছে। তারা এসেছিল এখানে নিরিবিলিতে শান্তিতে ঘুমোতে। তা ছাড়া সুখেনের নিজেরই আজ শরীরটা ভালো নয়– তারই ইচ্ছে করছিল শুয়ে পড়তে। কিন্তু এরা বাইরে বসে থাকলে কী আর হঠাৎ উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে ঘুমোনো যায়!

সামনে একটা প্লেটে শুকনো শুকনো করে ভাজা মুরগির মাংস জমা আছে। সূরযলাল নিজের বাড়িতে মাংস খেতে পারে না বলে ডাকবাংলোতে এসে খায়। প্লেটটা সুখেনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এক টুকরো মাংস মুখে দিন। তারপর গেলাসে একটু চুমুক দিন, দেখবেন কীরকম ভালো লাগে, গ্যারান্টি দিচ্ছি!

সুখেন হাত দিয়ে গেলাসটা সরিয়ে দিয়ে বলল, না ভাই, তোমরা খাও-না! তোমরা আনন্দ করছ, তাতে তো আমি বাধা দিচ্ছি না। আমাকে এরমধ্যে জড়াননা কেন? আমি গরিব লোক, আমার এসব বড়লোকি নেশা কী পোষায়?

সূরযলাল থতমত খেয়ে গেলাস সরিয়ে নিয়ে বলল, থাক! তবে থাক! আমি কী আপনাকে জুলুম করছি! আমি বলছিলাম কী, লাইফ তো খুব শর্ট, এর ভিতরে একটু ফুর্তি মজা যদি না করা যায়–

সুখেন গরিব বড়োলোকের কথাটা তোলায় হরিনাথের খোঁচা লেগেছে। সে সরু চোখে সুখেনের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি কেন খাবেন না, তা আমি জানি। পেটে পেটে ইচ্ছে থাকলেও–

সূর্যলাল বলল, কেন? কেন?

হরিনাথ ব্যঙ্গ করে বলল, ও খাবে না। বউয়ের ভয় পাচ্ছে। আমাদের তো বউ নেই–

এই ধরনের খোঁচা মারলে মানুষের পৌরুষে লাগে। সুখেন দুর্বল ধরনের পুরুষ। তা ছাড়া হরিনাথ তার দুর্বল জায়গাতেই খোঁচা মেরেছে। সুখেন সত্যিই করবীকে বেশ ভয় পায়। আজ করবী রেগে আছে বলে সে এমনিতেই মনে মনে অস্থির। তবু বউয়ের নামে খোঁচা মারলে অনেক পুরুষই হঠাৎ সাহসী হয়ে যায়। গেলাসটা তুলে নিয়ে অবহেলার সঙ্গে বলল, খাওয়ার মধ্যে কী আছে? খেলেই হয়। কিন্তু আমার এসব ভালো লাগে না।

হরিনাথ বলল, একটু টেস্ট করেই দেখুন-না ভালো লাগে কি না!

সুখেন গেলাসটা তুলে একসঙ্গে সমস্ত মদ গলায় ঢেলে দিল। বিষম খেল সঙ্গে সঙ্গে।

সূরলাল ব্যস্ত হয়ে হা-হা করে উঠল। বলল, করলেন কী, করলেন কী! সবটা এক সঙ্গে —আপনি নতুন–

সুখেন দুর্বলতা ঢাকবার জন্য বলল, আমার কিছু হয়নি। এমনি বিষম খেয়েছি।

সূরযলাল বলল, এ জিনিস আস্তে আস্তে খেতে হয়। পানিকা মাফিক ঢকঢক করে আপনি মেরে দিলেন!

সুখেন বলল, খেলাম তো! কিছু তো হল না আমার! তোমরা এসব খেয়ে কী আনন্দ পাও?

সুখেনের চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে। সে নিজেও আগে কল্পনাই করতে পারেনি যে, সামান্য এক গেলাস পানীয়র এতখানি তেজ। রীতিমতো ভয় ধরে গেছে তার, কিন্তু কিছুতে সেটা ওদের সামনে প্রকাশ করবে না। বার বার সে ফাঁকা অহংকার দেখিয়ে বলতে লাগল, এসব খেলে তার কিছু হয় না। এসব জিনিসের জন্য টাকা নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। ইচ্ছে হলে সে এক বোতলও খেয়ে ফেলতে পারে। এসব খাওয়ার মধ্যে কোনো বীরত্ব নেই।

হরিনাথ বলল, এই তো দাদা, বেশ কলজের জোর আছে। তাহলে আগে খাব না, খাব না করছিলেন কেন?

সত্যি, আমি আগে কখনো খাইনি।

আর একটু খান।

না, আর দরকার নেই।

খান-না। এই সূরযলাল দাও, দাদাকে দাও–

সূর্যলাল আবার ঢেলে দিয়ে বলল, নিন, সঙ্গে একটু মাংস খেয়ে নিন। মাংস না খেলে লিভার ঠিক থাকে না।

হরিনাথ বলল, একটু একটু মাংস চাখবেন আর গেলাসে একটু একটু চুমুক দেবেন। ওরকম গোঁয়ারের মতন কেউ এক ঢোকে খায়! আস্তে আস্তে খেলে, জিনিসটার স্বাদ পাবেন। ঠিক।

আমি আর খাব না।

এই যে বললেন, ইচ্ছে করলে এক বোতল খেয়ে ফেলতে পারেন? আর এক পেগেই হয়ে গেল! আপনার কিছু নেশা হয়েছে বলুন?

কিছু হয়নি।

তাহলে আর ওটুকু খেয়ে কী লাভ হল? আর একটা খান–

এইভাবে সুখেন তিন-চার গেলাস খেয়ে ফেলল। এবং ক্রমাগত বলতে লাগল, আমার কিছু হয়নি। আমার কিছু হয়নি! হরিনাথ মিটিমিটি হাসছে। এই হরিনাথ ধরনের লোকরা অন্যদের নেশা ধরিয়ে দিয়ে বে-কায়দায় ফেলে খুব আনন্দ পায়। সে কথার মারপ্যাঁচে সুখেনকে ক্রমাগত খাইয়ে যেতে লাগল।

ঘণ্টাখানেক কেটে যাওয়ার পর করবী বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ক্রুদ্ধ গলায় স্বামীকে বলল, তোমরা এখানে বসে বসে গল্প করবে, আর আমি একা ঘরে শুয়ে থাকব? এবার চলে এসো–অনেক রাত হয়েছে।

সূরযলাল হাসতে হাসতে বলল, ভাবিজি, আপনার কি ঘরের মধ্যে ভয় করছে নাকি? আপনাদের বাংলাতে যাকে বলে ব্রহ্মদৈত্য—এখানে সেই একটা ব্রহ্মদৈত্য আছে কিন্তু।

করবী সূরযলালের কথা গ্রাহ্য না করে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, একী, তুমি বসে বসে এইসব ছাইভস্ম খাচ্ছ!

সুখেন জড়িত গলায় বলল, একটুখানি শুধু টেস্ট করেছি। কিন্তু আমার কিছু হয়নি। কিছু যে খেয়েছি—তা টেরই পাচ্ছি না। কেন যে ওরা এইসব খেয়ে পয়সা নষ্ট করে।

বুঝেছি! আর খেতে হবে না, তুমি এবার ওঠো।

কেন, তুমি ভয় পাচ্ছ, আমি মাতাল হয়ে যাব? হাঃ-হাঃ-হাঃ? অত সহজ নয়! তুমি কিছু বুঝতে পারছ? আমি নর্মাল, কমপ্লিটলি নর্মাল!

ঠিক আছে, তোমার কিছু হয়নি। কিন্তু এখানে আর কত রাত পর্যন্ত বসে থাকবে?

কেন, তোমার ঘুম পাচ্ছে?

হ্যাঁ।

তাহলে তুমি একলা একলা ঘুমিয়ে পড়ো! আমি একটু বাদে যাচ্ছি।

একলা একলা ওই ঘরে থাকতে আমার বুঝি ভালো লাগে?

তাহলে তুমি এখানেই একটু বোসো!

না। তুমি ওঠো বলছি!

সূরযলাল বলল, ভাবিজি এত রাগারাগি করছেন কেন? বসুন-না। আপনিও একটু বসুন-না।

হরিনাথও বলল, বসুন বউদি, একটু বসুন। আমরা তো আর খানিকটা বাদে চলে যাব।

ওদের অনুরোধে করবী অনিচ্ছা সত্ত্বেও বসল। সূরযলাল তার দিকে মুরগির প্লেটটা বাড়িয়ে দিল—করবী সেটা ছুঁয়েও দেখল না।

সূরালাল সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে। ওদের বংশে কেউ কখনো মদ তো দূরের কথা মাছ-মাংসও ছোঁয়নি। সূরযলাল এরমধ্যে ওর সব ক-টারই ভক্ত হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে হরিনাথ তার প্রধান শাগরেদ। সূরযলালের আত্মীয়স্বজনরা বলে যে, বাঙালিদের সঙ্গে মিলেমিশেই তার এই অধঃপতন।

হরিনাথ বলল, বউদি, আপনার স্বামীটি কিন্তু বেশ খেতে পারে। ঢকঢক করে মেরে দিল কীরকম! আপনিও একটু খাবেন নাকি!

করবী বলল, ছিঃ!

করবীর সেই ছিঃ বলার মধ্যে এমন একটা দর্প এবং অবহেলা ছিল যে, কেউ আর অনুরোধ করতে সাহস পেল না।

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। করবী আসার পর সব গল্প থেমে গেছে। সূরযলাল আর হরিনাথ খেয়ে যাচ্ছে, সুখেনের গেলাস খালি। হরিনাথ বলল, দাদা আর একটু নেবেন নাকি?

সুখেন করবীর দিকে চেয়ে বলল, থাক, আর না!

করবী সুখেনের দিকে প্রখর চোখে তাকিয়ে আছে। মুখে কিছু বলল না। সুখেন অপরাধীর মতন একটু হাসল।

সূরযলাল গেলাসে ঢেলে দিয়ে বলল, নিন, আর একটু নিন। ভাবিজি কিছু বলবেন না!

সুখেন গেলাসটা তুলে নিয়ে বলল, আর খেয়েই বা কী হবে? এত খেয়েও তো কিছু হচ্ছে না। তোমরা ভেবেছিলে আমি এক চুমুক দিয়েই বেহেড হয়ে যাব।

হরিনাথ হাসতে হাসতে বলল, সত্যি দাদার কলজের জোর আছে!

এই সময়ে দূরে কিছু লোকের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। ওরা সতর্ক হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। ভালো করে তাকিয়ে দেখল, বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে ভিজতে চার-পাঁচজন হেঁটে আসছে। বাংলোর কম্পাউণ্ড দিয়ে।

সূরযলাল চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, কে?

কোনো উত্তর নেই।

গেলাস নামিয়ে রেখে ওরা সবাই তাকিয়ে রইল লোকগুলোর দিকে। ওরা ক্রমশ এগিয়ে আসছে।

সূর্যলাল গলা চড়িয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, কৌন হ্যায়?

এবারও সাড়া না পেয়ে সূর্যলাল পকেট থেকে রিভলবার বার করল। রাত বিরেতে কোথাও বেরোলে এটা সঙ্গে নিয়ে ঘোরে। রিভলবারটা হাতে নিয়ে সূরযলাল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তুম লোগ কৌন হ্যায়? খাড়া হো যাও! মত আও ইধার!

লোকগুলো থমকে দাঁড়িয়ে হিন্দিতে উত্তর দিল এবার। ওরা নিরীহ গ্রামের লোক। শর্টকাট করার জন্য বাংলোর কম্পাউণ্ড দিয়ে যায়। ওদের অন্যায় হয়ে গেছে, বাবুরা আছে জানলে আসত না!

লোকগুলো চলে যাওয়ার পর হরিনাথ হেসে বলল, তুমি একেবারে বন্দুক বার করে ফেললে ওদের দেখে?

সূরযলাল বলল, বিশ্বাস নেই! চোর-ডাকাতের তো কমতি নেই। সুখেন রিভলবারটা হাতে নিয়ে বলল, দেখি তো! গুলি ভরা আছে?

হ্যাঁ।

এটা তো অনেক পুরোনো কালের জিনিস দেখছি।

আমার পিতাজির ছিল।

তোমার টিপ কীরকম? কখনো ছুড়েছ এটা?

না দাদা, আভিতক কোনো মানুষের দিকে ছুড়তে হয়নি। শুধু ভয় দেখালেই হয়! পা

খি-টাখি শিকার করেছ তো? নাকি তাও করোনি?

সূর্যলাল বলল, দাদার তো বন্দুক-পিস্তল সম্বন্ধে বহুত জ্ঞান দেখছি। রিভলবার দিয়ে কি কেউ পাখি শিকার করে? বাড়িতে আমার আর একটা শটগান আছে। চলুন, আপনাকে একদিন শিকারে নিয়ে যাব। আপনি মারতে পারবেন তো?

সুখেন বললে, আমি কোনোদিন বন্দুক-পিস্তল হাতে ছুঁয়েই দেখিনি এর আগে। তোমারটাই প্রথম হাতে নিলাম।

করবী বলল, ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে না। রেখে দাও। হঠাৎ গুলিটুলি যদি বেরিয়ে যায়–

সূরযলাল বলল, না, হঠাৎ গুলি বেরিয়ে যাবে না। সেফটি ক্যাচ তোলা আছে। এই যে, দেখিয়ে দিচ্ছি।

রিভলবারটা হঠাৎ নামিয়ে রেখে সুখেন হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরল। একটা হেঁচকি তুলে বলল, একী, আমার মাথা ঘুরছে কেন?

সূরযলাল বলল, আপনার তাহলে বেশি হয়ে গেছে। আর খাবেন না।

সুখেন উঠে দাঁড়াতে গিয়ে টলে পড়ে যাচ্ছিল, করবী তাড়াতাড়ি তাকে ধরল। সুখেনের চোখ দুটো সম্পূর্ণ লাল, দৃষ্টি উদ্ভ্রান্তের মতন। আস্তে আস্তে বলল, করবী, আমার মাথা ঘুরছে, আমি দাঁড়াতে পারছি না।

করবী ধমক দিয়ে বলল, কেন ওসব খেতে যাও। এমনিতেই তোমার শরীর খারাপ–

ওরা যে বলল।

ওরা বললেই তুমি খাবে?

আমি এতক্ষণ খাচ্ছিলুম, কিন্তু টের পাইনি!

চলো, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বে চলো।

আমার ভীষণ গরম লাগছে।

এত শীতের মধ্যে তোমার গরম লাগছে? জল দিয়ে মাথা ধুয়ে দেব?

সূরযলাল খুব অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। সে উঠে এসে বলল, না, না, ভাবিজি, এখন পানি লাগালে অচানক ঠাণ্ডা লেগে যাবে। আপনি ঘরে নিয়ে শুইয়ে দিন। সুখেনদাদা, ভয় পাবেন না। হোড়া বাদ সব ঠিক হয়ে যাবে। এ-রকম সবারই এক-একদিন হয়।

সুখেন অবিশ্বাসের সুরে বলল, আমার এতক্ষণ কিছু হয়নি, হঠাৎ এ-রকম হল কেন? শেষ গেলাসটায় কিছু মিশিয়ে দিয়েছ নাকি?

সূরযলাল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কী মিশিয়ে দেব?

হরিনাথ বলল, তখনই বুঝেছি। যেরকম ঢকঢক করে খাচ্ছিলেন–

সুখেন তবু বলল, কিন্তু এতক্ষণ আমার কিছু হয়নি! হঠাৎ এ-রকম হল কেন? নিশ্চয়ই এবার আলাদা কিছু ছিল।

সূরযলাল বলল, কারুর কারুর এ-রকম হঠাৎই হয়। করবী বলল, এতক্ষণ তোমার কিছু হয়নি মানে কী? তোমার কথা জড়িয়ে গিয়েছিল।

মোটেই না!

ঠিক আছে। তুমি এখন ঘরে চলো!

আমাকে ওরা কিছু মিশিয়ে দিয়েছে। ওদের কিছু হল না, শুধু আমারই একা এ-রকম হল কেন? আমার গা গুলোচ্ছে, অসম্ভব গুলোচ্ছে–

সূরযলাল কাচুমাচু হয়ে বলল, দাদা আমাদের নামে মিথ্যে দোষ দিচ্ছেন। আপনাকে বললাম, আস্তে আস্তে খেতে–

সুখেন হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, আস্তে আস্তেই তো খেয়েছি! আগেরগুলোতে আমাকে শুধু জল দিয়েছ। আমি খেয়েই বুঝেছি, স্রেফ জল। কিন্তু শেষবারটায়, ওঃ, গলা জ্বলে যাচ্ছে– কী দিয়েছিলে বলো! বিষ খাইয়েছ আমাকে?

আপনি কী বলছেন? যান গিয়ে একটু শুয়ে পড়ুন, সব ঠিক হয়ে যাবে!

চোপ। আমি সব জানি!

করবী জোর করেই স্বামীকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। শুইয়ে দিল খাটে। ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিল মুখ। খাটে শুয়ে শুয়েই মাটির দিকে মুখ নীচু করে বমি করল সুখেন। সেসব পরিষ্কার করল করবী!

তারপর বলল, আলো নিবিয়ে দিচ্ছি। তুমি এবার ঘুমিয়ে পড়ো।

সুখেন চিৎকার করে বললে, না ঘুমোব না! ওরা আমাকে কী খাইয়ে দিয়েছে? বলো! বলো!

করবী বলল, তুমি খেতে গেলে কেন? তুমি কী কচি খোকা? তোমাকে জোর করে খাওয়াতে পারত কেউ?

তা বলে যা-তা কিছু একটা খাইয়ে দেবে?

চুপ। আস্তে কথা বলো।

কেন, আমি আস্তে কথা বলব কেন? আমি কি কারুকে ভয় করি?

সে-কথা হচ্ছে না। এখন না ঘুমোলে তোমারই আরও শরীর খারাপ হবে।

আমার শরীর খারাপের জন্য তুমি তো ভারি কেয়ার করো! আমাকে ওরা বিষ খাইয়ে দিল, তুমি কিছু বলতে পারলে না?

আমি তোমাকে ওসব ছাইভস্ম খেতে বারন করিনি?

কোথায় বারন করলে? শেষ গেলাসটা খাবার আগে আমি তোমার চোখের দিকে তাকালাম। তখন তুমি আমাকে বারন করতে পারতে না?

করিনি?

না, করোনি! তুমি দেখছিলে, আমি খাই কি না! সেইজন্যই তো আমি খেলাম!

তুমি খুব বুঝেছ তা হলে!

সুখেনের কথাবার্তা অন্যরকম হয়ে গেছে। কোনোদিন সে করবীকে ধমকায় না, তার নামে স্পষ্ট ভাষায় অভিযোগ জানায় না। আজ সে বেপরোয়া। চোখ দুটো লাল। হেঁচকি ওঠা এখনও বন্ধ হয়নি।

করবীর হাতটা চেপে ধরে সুখেন আস্তে আস্তে দৃঢ় গলায় বলল, সত্যি করে বলো তো, সূরযলাল এখানে যে আজ থাকবে, তুমি আগে থেকেই জানতে না?

বাঃ আমি তা জানব কী করে?

নিশ্চয়ই জানতে! সেইজন্যই আজ এখানে আসার জন্য তোমার এত গরজ!

কী যা-তা বলছ। গরজের আবার কী আছে। বৃষ্টি পড়লেই তো এখানে আসি।

আজ আমার শরীর খারাপ, আসতে চাইনি—তাও তুমি জোর করে—

শরীর খারাপ নিয়েও তুমি ওইসব খেলে? তোমার একটু কান্ডজ্ঞান নেই।

আমি না খেতে চাইলেও ওরা আমাকে জোর করে খাওয়াত!

আজেবাজে কথা বোলো না। এখন ঘুমোও।

আমি আজেবাজে কথা বলছি? আমি সব বুঝি! সূরলাল যে এখানে আসবে, তা তুমি খুব ভালো করেই জানতে। তাই তুমি জোর করে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ। আমি জানি, আমার সঙ্গে থাকতে তোমার ভালো লাগে না। আমি জেগে থাকলে তোমাদের অসুবিধে হবে-তাই আমাকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে-

আমি তো এসেই ওদের দেখে বলেছিলাম, তুমি ওদের চলে যেতে বলে দাও! তখন বললে না কেন?

আমি বললেও ওরা শুনত না। তুমি ওদের আসতে বলেছ—আমার কথা ওরা শুনবে কেন? আমার কথা কেউ শোনে না! আমায় কেউ ভালোবাসে না!

আচ্ছা পাগলামি করছ তো আজ। আমি এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, আমি এসব কিছু জানতাম না—এবার তোমার বিশ্বাস হবে?

সুখেন হঠাৎ হু-হু করে কাঁদতে আরম্ভ করল। অবোধ শিশুর মতন বার বার বলতে লাগল, আমি জানি, তুমি আমাকে ভালোবাসো না! তুমি আমাকে ভালোবাসো না?

করবী ধৈর্য ধরে ভিজে তোয়ালে দিয়ে আবার মুখ মুছিয়ে দিল সুখেনের। তারপর তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। অস্ফুট গলায় বলল, শোনো, তাকাও আমার চোখের দিকে। কিছু দেখতে পাচ্ছ না? বুঝতে পার না, আমি তোমায় সত্যিই ভালোবাসি?

সত্যি সত্যি বলছ?

তিন সত্যি করব?

আমার গা ছুঁয়ে বলো।

এই তো গা ছুঁয়ে বলছি।

না, পুরোটা বলো। আমার বুকে হাত ছুঁইয়ে রেখে বলল, আমি তোমায় ভালোবাসি। যদি মিথ্যেকথা বলো তা হলে আমি মরে যাব।

এই যে, বলছি, আমি তোমায় ভালোবাসি।

করবীর হাতখানা বুকে চেপে রেখে সুখেন আবার কাঁদতে লাগল।

গল্প থামিয়ে আমি একটুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর মাধবীর দিকে তাকিয়ে বললাম, মেয়েদের মন বোঝা খুব শক্ত। হয়তো করবী তার স্বামীর কাছে সত্যিকথাই বলেছিল। সে হয়তো সূরযলালের সঙ্গে আগে থেকে কোনো ষড়যন্ত্রই করেনি—সবটাই একটা গোযোগ। করবী তার স্বামীকে ভালোবাসে—এবং দুশ্চরিত্রা—একইসঙ্গে এ-রকম দু-টি ব্যাপার থাকা অস্বাভাবিক নয়।

মাধবী বলল, তার মানে? এ আবার কী অদ্ভুত কথা?

এ-রকম অদ্ভুত মানুষও আছে। করবী তার স্বামীকে ভালোবাসত—যেরকম অধিকাংশ মেয়েই ভালোবাসে। কিন্তু করবীর জীবনটা তার সংসারের ওই ছোট্ট গন্ডির মধ্যে আটকে

রাখতেও পারেনি। সেইজন্যই সূরযলালের সঙ্গে। তা ছাড়া, একটি মেয়ে কী একসঙ্গে একাধিক পুরুষকে ভালোবাসতে পারে না? মেয়েদের ভালোবাসা কি এত কম যে, একজনকে দিলেই ফুরিয়ে যাবে?

ওকে ভালোবাসা বলে না। ওর অন্য নাম আছে।

কী নাম?

তা আপনি ভালোরকমই জানেন।

তা হলে ভালোবাসা কাকে বলে—তা নিয়ে আগে আলোচনা করা দরকার।

কর্নেল সেন বললেন, সেটা কিন্তু হবে অ্যাকাডেমির আলোচনা, সেটা এ-গল্পের সঙ্গে খাপ খাবে না।

রঞ্জন আমাকে বলল, ঠিক আছে, তোমাকে আর গল্পের মধ্যে টীকাটিপ্পনী দিতে হবে না। শুধু গল্পটাই বলে যাও।

আমি বললাম, সুখেনকে যে ওরা বিষ-টিস কিছু খাইয়েছে তা-ও মনে হয় না। প্রথম প্রথম মদ খেতে গিয়ে লোকে হঠাৎ এইরকমভাবে আউট হয়ে যায়। সুখেন করবীর সঙ্গে আরও অনেকক্ষণ তর্কবিতর্ক মান-অভিমান করল। তারপর বলল, আমি আজ সারারাত ঘুমোব না।

করবী বলল, বেশ তো ঘুমিয়ো না।

দরজা-টরজা সব বন্ধ করে দাও!

দিচ্ছি।

আলো জ্বেলে রাখো। তুমি এসে শোও আমার পাশে।

কিন্তু কোনো নেশাগ্রস্ত লোকের পক্ষে সারারাত জেগে থাকা সম্ভব নয়। বিশেষত বিছানায় শুয়ে শুয়ে। করবী সুখেনের কথামতন আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল সুখেনের পাশে। সুখেন তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল, আজ একটুও ঘুমোব না। সারারাত গল্প করব। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই সুখেন ঘুমিয়ে পড়ল।

নেশাগ্রস্ত ললাকেরা একবার ঘুমিয়ে পড়লে সাধারণত সারারাতের মধ্যে আর জাগে না। সুখেনও যদি না জাগত, তাহলে সব কিছুই অন্যরকম হত। পরদিন সকালে আবার সব কিছুই স্বাভাবিক। কিছুটা লজ্জা, কিছুটা সন্দেহ থেকে যেত মনের মধ্যে—কিন্তু মানুষের জীবনে তাতে বড়ো রকমের কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

বাইরের বারান্দায় বসে হরিনাথ আর সূরযলাল আরও কিছুক্ষণ বসে খেল। ঘরের মধ্যে সুখেন আর করবীর সব কথাই তারা শুনতে পেয়েছে। সূরযলালের মুখখানা গম্ভীর। হরিনাথ কিন্তু বেশ খুশি খুশি। অন্য কেউ অসুবিধেয় পড়লে তার বেশ আনন্দ হয়।

সূরযলাল ব্যাজারভাবে বলল, কী ঝঞ্ঝাট রে বাবা! উনি খেলেন কেন? আমরা কী ওকে। জোর করে খাওয়াতে গেছি?

হরিনাথ বলল, এদিকে শালা কত বারফট্টাই! খেলেও আমার কিছু হয় না! এবার বোঝো, কিছু হয় কি না! আবার বলে কিনা আমরা বিষ মিশিয়ে দিয়েছি! যতসব নভিসের কান্ড!

এই হরিয়া, তুই শালা ওকে বেশি বেশি খাইয়েছিস?

মোটেই না! আমি নিজে কম খেয়ে অন্যকে বেশি দেব—আমি তেমন পাত্তর নই! শেষকালে নিজের মাল শর্ট পড়ে যাবে–

তাহলে হঠাৎ ওরকম আউট হয়ে গেল কেন?

কলজের জোর নেই, শুধু মুখে বড়ো বড়ো কথা!

আজ আর জমবে না। চল, ঘর যাই।

এত রাত্তিরে ঘর যাব? রামদাস খাবার দিল না এখনও। খাবার-টাবার খাই, তারপর আর একটু মাল খাব।

আমার আর ভালো লাগছে না।

একটু বাদে রামদাস এসে গরম গরম মাংস আর রুটি দিয়ে গেল। সূর্যলাল কিছুই খেল না প্রায়, হরিনাথ খেল চেটেপুটে। তারপর গেলাসে আবার মদ ঢেলে দুটো চুমুক দিয়ে বলল, আর পারছি না, পেট অ্যাইসা ভরে গেছে। চলো শুয়ে পড়া যাক।

সূরযলাল কোনো উত্তর দিল না।

হরিনাথ বলল, চলো ওস্তাদ, এবার শুয়ে পড়ি? তুমি না যাও, আমি যাচ্ছি। তোমার ইচ্ছে হলে এসো!

হরিনাথ চলে যাওয়ার পর সূরযলাল একটা সিগারেট ধরিয়ে বসে রইল একা। কোথাও কোনো শব্দ নেই। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত থমথমে। বৃষ্টি থেমে গেছে একটু আগে। মেঘের আড়াল থেকে উঁকি মারল মলিন চাঁদ। তারপর একটি দু-টি তারা। হাওয়া দিচ্ছে বেশ জোরে। সূরযলাল গায়ের শালটা জড়িয়ে নিল ভালো করে।

বেশ খানিকক্ষণ বাদে খুব ক্ষীণভাবে খুট করে শব্দ হল দরজা খোলার। সূরলাল পেছনে ফিরে তাকাল না পর্যন্ত। আবার একটা সিগারেট ধরাল। দরজা খুলে বাইরে এল করবী। হালকা পায়ে এগিয়ে এসে বসে পড়ল সূরযলালের পাশে। কোনো কথা বলল না, সূরযলালের হাত থেকে সিগারেটটা নিয়ে নিজের ঠোঁটে চুঁইয়ে টানল দু-একবার। তারপর সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিল বাইরে।

করবীর গায়ে গরম জামা নেই, শীতে সে কাঁপছে। সূরযলাল নিজের শালটা খুলে এগিয়ে দিল করবীর দিকে। করবী সেটা একসঙ্গে জড়িয়ে নিল দু-জনের গায়ে। দু-জনে হাত রাখল পরস্পরের কাঁধে।

করবী বলল, তুমি যদি ঘুমিয়ে পড়তে তাহলে জীবনে তোমার সঙ্গে আর কথা বলতাম না।

সূরযলাল বলল, আমি রাতভর এখানে জেগে থাকতে পারতাম।

ওকে অত মদ খাওয়ালে কেন?

আমি তো খাওয়াইনি। হরিনাথ খাইয়েছে। আমি একবার শুধু বলেছিলাম।

আর কোনোদিন খাওয়াবে না।

আচ্ছা।

তুমিও এত বেশি খাবে না। আজ খুব বেশি খেয়েছ।

এখনও পুরো হয়নি। তুমি এসেছ তো, তাই আর একটু খাব।

বৃষ্টি থেমে গেছে। মাঠের মধ্যে একটু হাঁটতে ইচ্ছে করছে।

চলো।

বারান্দা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল ওরা দু-জনে। দু-জনেরই গায়ে এক-ই চাদর জড়ানো-যমজ মূর্তির মতন ওরা ঘুরতে লাগল সামনের বাগানে। আকাশে অস্বচ্ছ আলো, হু-হু করছে শীতের হাওয়া—তারমধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছে এক স্বাস্থ্যবান যুবক ও এক স্বাস্থ্যবতী যুবতী। বাকি সবাই এখন ঘুমন্ত।

তবু, মাঝরাত্রে সুখেনের নিয়তি তাকে জাগিয়ে দিল। এমনিতেই তার গাঢ় ঘুম, আজ এত নেশা হওয়া সত্ত্বেও তার ঘুম ভাঙার তো কোনো প্রয়োজন ছিল না। পাশ ফিরতে গিয়ে দেখল বিছানায় অনেকখানি শূন্যতা। ঘর অন্ধকার, অথচ করবী বিছানায় নেই। ঘরের মধ্যে হ্যাজাকটা করবী ঘুমোতে যাওয়ার সময়ই নিভিয়ে দিয়েছিল-বারান্দার হ্যাজাকটাও এখন নেভাননা। নিচ্ছিদ্র অন্ধকার। সুখেন ধড়মড় করে উঠে বসল।

সুখেনের তখনও পুরো নেশা, মাথা টলমল করছে। তবু সে খাট থেকে নেমে নি:শব্দে চলে এল পাশের ঘরে। সে-ঘরও অন্ধকার। খাটের ওপর বিশ্রী ভঙ্গিতে ঘুমোচ্ছে হরিনাথ।

সুখেন বেরিয়ে এল বারান্দায়। বারান্দার এককোণে মেঝের ওপর দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে করবী, তার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে সূরলাল। সূরযলালের হাতে মদের গেলাস, সেটা উঁচু করে দিচ্ছে করবীর মুখের কাছে। করবী আলতো করে চুমুক দিয়ে খানিকটা খেল, তারপর মুখ নীচু করে চুমু দিল সূরযলালের ঠোঁটে।

ওরা এমনই নিশ্চিন্ত এবং ভাবে বিভোর ছিল যে, সুখেনের আসার ব্যাপারটা টেরই পায়নি। সুখেন প্রায় এক মিনিট থমকে থেকে ওদের দেখল। যেন সে, নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। কিংবা, করবী যেন তার স্ত্রী নয়, অন্য একটি মেয়ে ও পুরুষের ঘনিষ্ঠ দৃশ্য দেখে ফেলেছে সে। বৃষ্টি থেমে গেছে, অন্ধকার তেমন গাঢ় নয়—বারান্দার কোণে ওদের ওই অন্তরঙ্গ ভঙ্গি এক হিসেবে খুব সুন্দর।

একটি মেয়ে আর একটি ছেলে যদি ওরকম অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে থাকে—তাহলে দূর থেকে সেটা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে যেকোনো লোকেরই ভালো লাগবার কথা। একমাত্র নিজের স্ত্রীকে ওই অবস্থায় পরপুরুষের সঙ্গে বসে থাকতে দেখলে স্বামীর ভালো লাগে না। সুখেন যেন ব্যাপারটা প্রথমে ঠিক বিশ্বাসই করতে পারেনি। তাই প্রথম কয়েক মুহূর্ত সে বিভোর হয়ে তাকিয়েছিল সে-দিকে। তারপর তার বুকের মধ্যে চড়াৎ করে উঠল।

হঠাৎ সুখেনের চোখ পড়ল চেয়ারের ওপরে রাখা রিভলবারটার দিকে। সেটা তুলে নিয়ে কয়েক পা এগিয়ে এসে সে বিকৃত গলায় বলল, খুন করব! আজ দু-জনকেই খুন করব!

ওরা দু-জনে ছিটকে সরে গেল দু-পাশে। সূরষলাল উঠে দাঁড়াবার আগেই গুলি চালাল সুখেন।

সিমেন্টের মেঝেতে সেই গুলির শব্দ হল প্রচন্ড গুলি সূরযলালের গায়ে লাগেনি।

সূরযলাল লাফিয়ে উঠে সুখেনকে ধরার চেষ্টা করল কিন্তু সুখেন ততক্ষণে রিভলবারটা ঠিকভাবে ধরে লক্ষ্য স্থির করছে। সূরযলাল চেঁচিয়ে বলল, দাঁড়ান! এ কী করছেন? একটা কথা শুনুন! সুখেন আবার গুলি করতে যাওয়ার আগেই করবী এসে তার সামনে দাঁড়াল, হাত তুলে বলল, কী করছ দাঁড়াও! সূর্য অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল আমি ওর কপালে জল দিয়ে–

সুখেন উন্মত্তের মতন বলল, সরে যাও! আমি নিজের চোখে দেখেছি।

আমি আগে ওকে মারব। তারপর তোমাকেও–

করবী সূরযলালকে সম্পূর্ণ আড়াল করে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি ভুল দেখেছ। পাগলামো কোরো না–তুমি খুনের দায়ে পড়বে–

আমার ফাঁসি হোক। কিছু যায় আসে না। আমি ভুল দেখেছি? আমি চিরকালই ভুল দেখি। সরে যাও–

না, আমি সরব না। তুমি আমাকে মারো আগে। সূরয তুমি চলে যাও –

সর হারামজাদি–

না, আমি সরব না। তুমি আমাকে মারতে চাও মারো--।

করবীর এইটুকু বিশ্বাস আছে যে, সুখেন কিছুতেই তার ওপর গুলি চালাতে পারবে না। যত অন্যায় করুক, তবু করবীর ওপর সুখেনের সাংঘাতিক দুর্বলতা। সুখেন পিস্তলটা

হাতে ধরে, সরে যাও, সরে যাও করছে, কিন্তু গুলি চালাতে পারছে না। তার হাত কাঁপছে। করবী এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছে সুখেনের দিকে। অসম্ভব তার মনের জোর, এগোতে এগোতে সে বলছে, সূরয তুমি পালিয়ে যাও, তুমি পালিয়ে যাও।

প্রথম গুলির আওয়াজ শুনে হরিনাথও জেগে উঠেছিল। সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বিস্ফারিত চোখে। সে আছে সুখেনের পেছন দিকে। করবী তাকে চোখের ইশারায় বলার চেষ্টা করল, পেছন থেকে সুখেনের হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিতে। কিন্তু হরিনাথের সে সাহস নেই।

করবী সুখেনের একেবারে কাছে এসে হাত বাড়িয়ে বলল, ওটা আমাকে দিয়ে দাও।

সুখেন বলল, সরে যাও! খুন করে ফেলব। একদম খুন করে ফেলব আজ! হারামজাদি–

সূরলাল পালিয়ে যায়নি। সে বলল সুখেনদাদা, ওটা রেখে দিন। আমি আপনাকে সব কুছ বলছি। মাথা খারাপ করবেন না–

সুখেন বলল, আমি তোমাকে খুন করব, শয়তান কাঁহাকা!

করবী বলল, তা হলে আগে আমাকে মারো। আমাকে মারছ না কেন? এই তো আমি এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছি–

তোমাকেও মারব। দু-জনকেই একসঙ্গে। আগে ওই কুত্তাটাকে–

তারপর একমুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে গেল। সুখেন করবীকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে গিয়েও পারল না। করবীই ধরে ফেলেছে তাকে, অন্য হাত দিয়ে করবী খপ করে কেড়ে নিতে গেল রিভলবারটা, সুখেন সেটা সরিয়ে জোরে চেষ্টা করতেই গুলি ছুটে গেল। গুলি ফুড়ে গেছে সুখেনের গলা দিয়ে। ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল সে। রিভলবারটার শব্দ হল ঠক করে।

হরিনাথ তক্ষুনি দৌড়ে এসেছে বাইরে। একটি কথা না বলে হরিনাথ ছুটতে লাগল মাঠ ভেঙে। সূরযলাল এগিয়ে এল, করবীর কাছে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, মর গেয়া তুমি মেরে ফেললে? একদম মেরে ফেললে?

করবী হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে সুখেনের পাশে। সুখেনের প্রাণ বেরিয়ে গেছে গুলি লাগার সঙ্গেসঙ্গে। আর একটা কথাও সে উচ্চারণ করতে পারেনি। গলার ক্ষত থেকে, মুখ থেকে রক্ত তখনও বেরোচ্ছে গলগল করে। একটু আগে মানুষটা এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, এখন আর তাকে চেনাই যায় না।

করবী মুখ নীচু করে বলল, এ কী? মরে গেল? একদম মরে গেল?

সূরযলাল বলল, তুমি রিভলবারটা কেড়ে নিতে পারলে না শুধু? তুমি ওকে মারলে কেন?

করবী রক্তহীন বিবর্ণ মুখে সূরযলালের দিকে তাকাল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, আমি মেরে ফেললাম? আমি তোমাকে বাঁচাতে চাইলাম, আমি তোমাকে বাঁচিয়ে দিলাম—এখন তুমি বলছ, আমি মেরে ফেলেছি?

পাগলের মতন হয়ে গেল করবী, সূরযলালের গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বুকে গুম গুম করে কিল মারতে লাগল। সূরযলাল অতিকষ্টে তাকে ধরে ঝাঁকানি দিয়ে শান্ত করল একটু, তারপর দু-জনেই ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করল, দেখল সুখেনের দেহ। মৃত্যু সম্পর্কে সন্দেহ করার কোনো উপায়ই নেই। ওরা দু-জনে ঘোরলাগা চোখে তাকাল পরস্পরের দিকে! করবী বলল, সব শেষ। আমার এখন কী হবে?

সূরযলাল করবীকে ধরে দাঁড় করাল। তারপর বলল, চলো, আমরা জলদি এখান থেকে চলে যাই।

করবী বলল, চলে যাব? তারপর ওর কী হবে?

সেসব পরে ব্যবস্থা করলেই হবে। এখন চলো—

কিন্তু সূরযলালের চেয়ে করবীর বুদ্ধি বেশি। সে বুঝতে পেরেছিল, এইভাবে পালিয়ে বাঁচা যায় না। পালাবার আগে একটা কিছু প্ল্যান ঠিক করে নিতে হবে।

ততক্ষণে চৌকিদার রামদাস এসে কাছে দাঁড়িয়েছে। সূরযলাল বলল, আমাদের বাঁচতেই হবে। তারপর রামদাসের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বলল, একটা কথা ফাঁস করবি তো তোর জবান ছিড়ে দেব!

এরপর করবী আর সূর্যলাল একসঙ্গে বাঁচবার চেষ্টা করেছে। কেউ কারুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি।

কথা থামিয়ে আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলাম। ভালো করে একটা টান দিয়ে বললাম, এর পরের ব্যাপার তো বোঝাই যাচ্ছে। মৃতদেহটা সরানোই ওদের প্রধান কাজ ছিল। কিন্তু ডাকবাংলোর আশেপাশে কোথাও পুঁতে ফেলতে সাহস করেনি। ডাকবাংলোর কাছে খোঁজাখুঁজি হবেই। জিপগাড়িটা নিয়েও মুশকিল, ওটা সরাতেই হবে, কিন্তু কেউ গাড়ি চালাতে জানে না। সব কিছু ধুয়ে মুছে ওরা পরিষ্কার করে রাখল। ডেডবডিটা লুকিয়ে রাখল খাটের নীচে। ঠিক হল, পরের রাত্তিরে সব ব্যবস্থা হবে। করবী ওইখানেই রয়ে গেল, সূরযলাল গেল সব ব্যবস্থা করতে। সূরযলাল আর না ফিরতেও পারত। সূরযলালের টাকাপয়সা আছে। অনেক। ওইসব জায়গায় টাকাপয়সার জোরে অনেক কাজ হাসিল করা যায়। সূর্যলাল টাকা দিয়ে লোকের মুখ বন্ধ করে নিজে যদি সব কিছু অস্বীকার করত তা হলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করা খুব সহজ হত না। কিন্তু সূরযলাল তা করেনি। সে ফিরে এসেছিল। ইতিমধ্যে কর্নেল সেন সেখানে হাজির হয়েই সব গোলমাল পাকিয়ে দিলেন। একে উনি মিলিটারির লোক—এবং ওঁর সঙ্গেও রিভলবার। ওঁকে কিছুতেই নিরস্ত করা গেল না। আমার ধারণা, কর্নেল সেন যখন প্রথম ডাকবাংলোটাতে হাজির হন, তখন করবী চৌকিদারের ঘরেই লুকিয়ে ছিল। কি, ঠিক বলছি?

কর্নেল সেন বললেন, তোমার বর্ণনা মোটামুটি ঠিক বলেই মনে হয়। অন্তত বেশ বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে। কিন্তু তুমি বলছ, খুনটা আসলে অ্যাকসিডেন্ট? ওরা কেউ খুন করেনি?

রঞ্জন বলল, ভেরি আনলাইকলি! সুনীল যেভাবে চরিত্রগুলো এঁকেছে, তাতে মনে হয়, ধরা পড়লেও ওরা কেউ চট করে সুখেনকে খুন করবে না। তার কোনো দরকার ছিল না। রিভলবারটা যদি ওখানে না থাকত—আচ্ছা, রিভলবারে কারুর হাতের দাগ পাওয়া যায়নি?

কর্নেল সেন বললেন, সে হাতের দাগের কোনো মূল্য নেই। ওদের তো ও-সম্পর্কে আইডিয়া নেই—তাই রিভলবারটা ওরা সবাই ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। সবারই হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। সুতরাং ও-থেকে কিছু প্রমাণ করা যায় না।

মাধবী বলল, অ্যাকসিডেন্ট-ট্যাকসিডেন্ট বাজেকথা! আমি বলছি, ওই করবীই খুন করেছে। আগে থেকে প্ল্যান করেই খুন করেছে।

আমি হাসলাম। রঞ্জন বলল, তোমার করবীর ওপর খুবই ঘেন্না দেখছি। এখনও তুমি ভাবছ, ওই করবীই নিজের হাতে ইচ্ছে করে তার স্বামীকে খুন করেছে? আমার কিন্তু মেয়েটাকে অত খারাপ মনে হয় না। তা ছাড়া, স্বামীকে খুন করার দরকার কী? ও তো অনায়াসেই সুখেনকে ছেড়ে সূরযলালের সঙ্গে থাকতে পারত। অনেক বিবাহিতা মেয়েরা করে না এ-রকম? এজন্য কী খুন করার দরকার হয়?

মাধবী জিজ্ঞেস করল, মামাবাবু, আপনি এবার সত্যি করে বলুন তো, ওই মেয়েটাই খুন করেনি?

কর্নেল সেন বললেন, প্রকৃতপক্ষে ওদের দুজনের মধ্যে কে খুন করেছে, তা শেষ পর্যন্ত কিছুতেই প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। সুনীলের অ্যাকসিডেন্টের থিয়োরিটাই ঠিক হতে পারে। এমনকী আত্মহত্যা করাও অসম্ভব নয়। করবী আর সূরযলাল দু-জনেই শেষপর্যন্ত বলে

গেছে যে, সুখেন আত্মহত্যা করেছে। এইকথা থেকে একচুলও নড়েনি। রিভলবার থেকে দুটো গুলি খরচ হয়েছিল। একটা গুলি সুখেনই ছুড়েছিল সূরযলালের দিকে। গায়ে লাগেনি। সূরযলাল রিভলবারটা কেড়ে নিয়ে আত্মরক্ষার জন্য গুলি করে এ-রকম একটা থিয়োরিও প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছিল। তাতে সূরযলালের ওপর ঠিক হত্যার অভিযোগ আসত না, কিন্তু সূরযলাল সে-কথা কিছুতেই স্বীকার করেনি। সে বার বার বলেছে, সুখেন আত্মহত্যা করেছে তার বা করবীর ওতে কোনো হাত নেই। মৃতদেহটা লুকোবার চেষ্টা করেছিল কেন? ওরা ভয় পেয়ে মাথা গুলিয়ে ফেলেছিল—এই ওদের বক্তব্য।

বিচারের সময় ওদের যদি দেখতে তোমরা। করবী আর সূরযলাল পরস্পরের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে থাকত, শুধু, যেন পরস্পর এক সাংঘাতিক বন্ধনে বাঁধা। আর কারু সঙ্গে একটাও কথা বলত না, কোনোরকম অপরাধী বা অনুতপ্ত বা ক্ষমাপ্রার্থীর ভাব ছিল না তাদের মধ্যে! সরকার পক্ষের উকিল ওদের জেরা করে করে একেবারে ছিড়েখুঁড়ে ফেলতে চেয়েছে। এমনসব জঘন্য অভিযোগ এনেছে দু-জনের নামে যে, তা কল্পনা করা যায় না। সূরযলাল আরও তিন-চারটি দুশ্চরিত্রা মেয়ের সঙ্গে নাকি কত কী কান্ড করেছে—এসব কথাও বলেছে করবীর সামনে, তবু ওরা এক চুলও বিচলিত হয়নি। পরস্পরের নামে কক্ষনো কোনো দোষারোপ করেনি। শুধু মন্ত্রমুগ্ধের মতন দু-জনে দু-জনের দিকে তাকিয়ে থাকত।

মাধবী জিজ্ঞেস করল, শেষপর্যন্ত ওদের শাস্তি হয়নি?

কর্নেল সেন বললেন, হ্যাঁ হয়েছিল। খুনের অভিযোগ অবশ্য প্রমাণিত হয়নি। অন্যান্য সব কারণ মিলিয়ে করবীর জেল হল তিন বছর, আর সূরযলালের পাঁচ বছর। করবী আড়াই বছর পরেই ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল। সূরযলাল তখন আবার একটা ভুল করে। এমনিতে ছটফটে স্বভাবের মানুষ, করবী জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার খবর নিশ্চয়ই কোনো উপায়ে ওর কাছে পৌঁছেছিল। ও তখন জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করে। ধরাও পড়ে যায়। তাতে ওর শাস্তি বেড়ে যায় আরও কয়েক বছর। জানি না আর কোনো দিন ওদের দুজনের দেখা হয়েছে কি না।

করবী জেলের বাইরে ঘুরে বেড়াবে আর ও জেলের মধ্যে বন্দি থাকবে, এই চিন্তা বোধ হয়, সূরযলালের কিছুতেই সহ্য হচ্ছিল না।

একটুক্ষণ আমরা সবাই চুপ করে রইলাম। রঞ্জন বলল, আচ্ছা মামাবাবু, একটা জিনিস লক্ষ করেছেন? সুনীল এমনভাবে করবী আর সূরযলালদের কথা বলে গেল, যেন ও, একেবারে সব সময় ওখানে উপস্থিত ছিল ওদের সঙ্গে...ডায়ালগ পর্যন্ত।

আমি বললাম, ওটা লেখকদের লাইসেন্স! কোনো ছেলে আর মেয়ে যখন কোনো নির্জন জায়গায় বসে কথা বলে, তখন কি কোনো লেখক আড়ালে থেকে তাদের কথা শোনে? কিংবা তাদের পাশে গিয়ে বসে থাকে? তবু, ওদের সেই নির্জনে বসে থাকা ও কথাবার্তা হুবহু ফুটিয়ে তোলা হয় কী করে? লেখকরা মানুষের চরিত্র স্টাডি করে। তারপর সেই চরিত্র অনুযায়ী লেখকরা তাদের প্রেমের দৃশ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। আমি ওদের ব্যাপার ঠিক বানাইনি, বলতে বলতে এমনিই মনে আসছিল, যেন হুবহু হত্যাকান্ডটা দেখতে পাচ্ছিলাম। এবং সত্যিকথা বলতে কী জানিস, করবী মেয়েটার ওপর আমার খানিকটা সহানুভূতিও এসে যাচ্ছিল।

মাধবী ভঙ্গি করে বলল, তা তো আসবেই! পুরুষ তো!

কর্নেল সেন বললেন, করবী মেয়েটির মধ্যে অসাধারণ একটা কিছু ছিল। তাকে নিছক একটা খারাপ মেয়ে বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শহরে থেকে শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ পেলে ও হয়তো বড়ো একটা কিছু করতে পারত। এই ধরনের মেয়েকে কেন্দ্র করে পৃথিবীতে অনেক বড়ো বড়ো কান্ড ঘটে। ওর প্রতি খানিকটা সহানুভূতি থাকা অস্বাভাবিক নয়। আমারও বোধ হয় একটু একটু আছে—যদিও আমার জন্যই ওরা ধরা পড়েছিল।

তোমাদের আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। করবীর সঙ্গে আমার আর একবার দেখা হয়েছিল। ওই ঘটনার বছর পাঁচেক পর। লছমনঝোলায় এক মহিলাকে আমার হঠাৎ খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। গঙ্গার ঘাটের একেবারে শেষধাপে জলে পা দিয়ে

দাঁড়িয়েছিলেন– লাল পাড়ের গরদের শাড়ি পরা, একগোছা চুল পিঠের ওপর ছড়ানো। বোধ হয় ওই চুল দেখেই আমি চিনতে পারলাম। করবী। ওকে দেখে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে, আমার জন্যই ওর জীবনে একটা বিপর্যয় এসেছে। আমাকে ওর পছন্দ করার কথা নয়। আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে গেলাম। ডেকে বললাম, এই যে শুনুন!

তখন তার চেহারা একটুও খারাপ হয়নি, আকর্ষণীয়। মুখ ফিরিয়ে তাকাল আমার দিকে। আমাকে চিনতে না পারার কথা নয়, কিন্তু সেরকম কোনো ভাব দেখালো। চোখের দিকে তাকিয়ে রইল দু-এক পলক, বড়ো অদ্ভুত সেই দৃষ্টি। তারপর জলের মধ্যে নেমে গেল। জান তো, ওখানকার গঙ্গায় কীরকম স্রোত, তারমধ্যেই সাঁতার কেটে দূরে চলে গেল অবলীলাক্রমে। আমি কোনো কথা বলার সুযোগ পেলাম না।

তবে, আমার ধারণা ওই মেয়ে যেখানেই থাকবে, আশপাশের লোকের জীবনে বিপদ ডেকে আনবে। কিছুদিন বাদেই লছমনঝোলায় একজন ব্যবসায়ী খুন হয়। আমার বিশ্বাস করবী সেই ব্যাপারের সঙ্গেও জড়িত। সেবারে অবশ্য আমি আর গোয়েন্দাগিরি করতে যাইনি।

তারপর তো অনেক বছর কেটে গেছে-করবী বেঁচে থাকলে এখন তার যথেষ্ট বয়েস। কিন্তু এখনও আমার মাঝে মাঝে তার সেই চেহারাটা মনে পড়ে। সেই সকাল বেলা স্নান করার পর চুল খোলা, জ্বলজ্বল করছে সিঁদুর।

রঞ্জন উঠে গিয়ে জানলার পর্দা সরিয়ে দিল। বাইরে তাকিয়ে বলল, ভোর হয়ে এসেছে। আলো ফুটেছে।

কর্নেল সেনও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলো, তাহলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ানো যাক! অনেকদিন সূর্য ওঠা দেখিনি।